MAYA HORIN

Gargi Bhattacharya

****

Copyrighted Material

মায়া হরিণ

গার্গী ভট্টাচার্য

:: শ্রী হয়গ্রীবার পাদপদ্মে অর্পিত ::

যাঁর কৃপায় আমি এই উপন্যাসটি সাতদিনে

২৮ ঘন্টায়, লিখতে সক্ষম হয়েছি

ছোট ছোট অনু গল্প দিয়ে সৃষ্ট এই উপন্যাস পাঠককে ভাবনার পাপড়ি যোগায় আর নতুন এক দিগন্তের সন্ধান দেয় যা মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে।

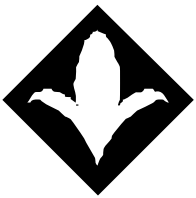

১।

দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে বিল্ডিংগুলি। মালঞ্চ , মধুবন , মহুয়াবনী , মাতঙ্গী - নতুন তৈরি হয়েছিলো। এই মুলুকে এই নিয়ে গোটা আষ্টেক বিল্ডিং। পর পর কিছু কালের মধ্যেই পুড়ে গেলো। আসলে ওগুলি ভেঙে পড়ছিলো। তখনই আগুন লাগে। আগে কিছু ভেঙেছিলো। পরে দুটি পড়লো। এই নিয়েই অঞ্চলে শোরগোল। সবাই আলোচনা করছেন। আজ নাকি বিল্ডিং মেটেরিয়াল সংক্রান্ত তদন্ত হবে। শোনা যাচ্ছে কানাঘুষো। চন্ডী মৈত্র শুনেছেন। এই তল্লাটে বাড়ি কিনেছেন। অবসর নিয়ে একলা থাকেন। কাছেই অরণ্য। আগে দুপুরে হাঁটতে যেতেন। একবার দাবানল লাগে। সেই সময় উনি মাঝ জঙ্গলে। সামনে আগুন , পেছনে পালাতে গেলে দেহের নানাভাগ পুড়ে যায়। ওর স্ত্রীও ৭৫% পুড়ে যান। তবুও ওকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী রমণী বলে সান্ত্বনা দিতেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলনা। ভদ্রমহিলা মারা গেলেন তার কয়েকদিন পরেই। মনটা তখন থেকেই ভারাক্রান্ত। চন্ডী মৈত্র এখন পোড়া মানুষ, আধ পোড়া। তার পোড়া মন সারাতে ধ্যান করতেন। সেই সুত্রেই আলাপ এই তন্ত্র রুদ্রানী কর্পোরেশানের মালিক মিস যোগিনী সেনের সাথে। উনিও শ্রী শ্রী ছবিশঙ্করের প্রাণসঞ্চার ধ্যানম্ শিখতেন। এইসব জায়গায় যাবার এই এক মস্ত সুবিধে। সহজেই সমাজের উঁচুতলার মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়। তার মতন ছাপোষা এক অফিসার সহজেই ফেসবুকে যোগাযোগ করতে পারেন এই কর্পোরেট দুনিয়ার তারকার সাথে। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান। উত্তর পান।

যোগিনীর আরেক বোন আছেন , মৈথিলী। উঁনি সেতার বাজান। ব্যবসায় কোনো উৎসাহ নেই, তেমন নাকি পারেনও না। স্নাতোকোত্তর একটি ডিগ্রি অবশ্যই আছে তার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার সাথেও আলাপ হয়েছে ধ্যানাশ্রমে। মেয়েটি ভারি ভালো। খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে চন্ডী মৈত্রকে। চন্ডী কাকু বলে। একবার ওদের বিশাল বাড়িতে নিয়ে যায় , ওদের নানান শহরে বাড়ি আছে। তবে এই মেয়ে থাকে বাংলায় বেশি। উঁনি বড় কেকের প্যাকেট নিয়ে যান। ওদের সুবিশাল বাড়ির তুলনায় যা নুড়িপাথর। কিন্তু দুই বোনের ব্যবহার এতই মধুর যে উঁনি একটুও লজ্জিত হবার অবকাশ পাননা। মৈথিলী তো : চন্ডী কাকু চন্ডী কাকু করে ছুটে এলো ! তারপরে অনেক আদর আপ্যায়ন হল। নিজের বাড়ির মতন। উঁনি এঁচোরের ডালনা ও পটলের নারকোল দিয়ে রান্না পছন্দ করেন। তাই বানিয়েছিলো যোগিনী নিজ হস্তে। ওরা দুই বোন খুব মিশুকে। কে বলবে ওরা এত বড় ব্যবসাদার ! ওদের বিশাল , রুচিপূর্ণ বাড়িতে ওরা আপন ভাবে মিলে গেলো ওঁর মতন এক সাধারণ মানুষের সাথে। কত গল্প, আলাপন হল। সুন্দর কাটলো একটি দিন।

২।

নিখিল আশুতোষ মোদি আদতে পার্শি । বাস ছিলো উত্তরে । দাদু সেইকালেই উইম্বল্ডন দেখতে যেতেন । বিরাট ধনী । মোদি এই কোম্পানির এক কর্ণধার । খুবই ব্রিলিয়ান্ট ম্যানেজার কিন্তু দুটি পা খুইয়েছেন একটি দুর্ঘটনায় , আগেই । আসলে উনি কলেজে পড়তে বহু দর্শন পড়ে , স্থির করেন যে কালীমাতার সেবায় জীবন কাটাবেন । তাই খুবই মেধাবী ও এলিজিবেল ব্যাচেলার হওয়া সত্ত্বেও ওর মা বিয়ে দিতে অক্ষম । বহু ধনীর দুলালী আসেন কিন্তু উনি বেঁকে বসেন । কালী মায়ের মন্দিরে উনি শক্তির আরাধনার পাশে পাশে নিজ হস্তে মেঝে ঝাড় পোছ করা , ভোগ রান্না ও কলেজে অধ্যাপনার মতন কম মাইনের চাকরির মোট মাইনে থেকে অনেকটাই দেবস্থানে দান করে দিতেন । উনি ম্যানেজমেন্ট পাশ করেন আই আই এম থেকে কিন্তু কলেজে পড়াতেন কোম্পানিতে মোটা মাইনের লোভনীয় সব চাকরিতে যোগ না দিয়ে । প্লেন লিভিং , স্পিরিচুয়াল থিংকিং ।

এইভাবে কিছুকাল চলে । শেষকালে মায়ের মনের প্রার্থনায় কিনা জানা নেই কালীমাতা নড়ে চড়ে বসেন । তাঁর মন গলে । নিখিলের এক ছাত্রী , মধুলিকা ওকে প্রোপোজ করে বসেন । ক্লাসের মধ্যেই । বলেন : এই স্যারকে ছাড়া আমি বিয়ে করবো না । ওকে একটি চুমুও দেন সর্বসমক্ষে । নিখিল লজ্জিত । কিঞ্চিৎ রক্তিম ওর মুখ চোখ । সেই শুরু । কৌমার্য্য ভাঙে নিখিলের । শুরু হয় একসাথে বেড়াতে যাওয়া , সুদূরে । বনে পাহাড়ে সমুদ্রে । মধুলিকার শরীরের বিভায় আভায় হারিয়ে যাওয়া । নীল নির্জনে , চাঁদের হাটে

ডুবে যাওয়া ।এক সুন্দর সন্ধ্যায় ওরা যায় দেব সেবাশ্রম মঠে । ওখানে কিছুদিন মিশন সংলগ্ন ঘরে থাকে । সুন্দর ব্যবস্থা । পরিচ্ছন্ন । সুবাতাস । সুনীল । সুললিত । সুমিলন । ওদের এই নিষিদ্ধ সম্পর্ক ওর মা মেনে নেননি । বেড়েছে দূরত্ব । মেয়েটি ভালো হলেও বিয়ের আগে দৈহিক মিলন ওর মায়ের মন:পূত নয় , উনি প্রাচীন পন্থী ।

গড অফ বিগ থিংক্স হয়ত রুষ্ট , কারণ ওদের দৈহিক মিলনের পরে পরেই ফেরার সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় পা দুটি চিরতরে হারান মোদি । আরো আশ্চর্য হবার মতন ঘটনা হল এই যে ওর সঙ্গিনী মধুলিকা পাল ওকে ছেড়ে চলে যান । বলেন : এই লেম ডাক আমার কোনো কাজে লাগবে না ! মোদি মৃদু হাসেন : খুব আস্তে বলেন পার্শ্বচরকে : দিস ইজ লাইফ । লাইফ ইজ ইলিউশান । সব কুছ মায়া হ্যায় ।

টাইম ইজ দা বেস্ট হিলার । আমি সব ভুলে যাবই , একদিন । মধুলিকা আমার জীবনের মধু হরণ করতে পারবে না ।

৩।

যোগিনী তো হঠাৎ মারা গেলো। কোনোভাবে রক্তে বিষক্রিয়া হয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়েও সুবিধে কিছু হলনা। এটা আধা শহর। কাছের বড় শহর নাগপুর। কিন্তু সুবিধে করা যায়নি। মৈথিলী এখানেই ছিলো তখন।

চন্ডী মৈত্রর কন্যা ফোনে বলে : দেখো বাবা ওরা কত্তো বড়লোক তবুও যোগিনীদিদিকে বাঁচাতে পারলো না। উঁনি খুব অমায়িক ছিলেন। তোমাকে কত্তো ভালোবাসতেন , শ্রদ্ধা করতেন !

তা করতো মেয়েটি। খুবই করতো। সেই যোগিনী মৃত্যুর পরে তার সমস্ত ব্যবসার দায়িত্ব দিয়ে গেলো ওর সৎ ভাই কুন্দন কে। ওর বাবার মিস্ট্রেসের ছেলে। যোগিনীর মা ওদের কমবয়সে মারা যান। দুই বোনকে রেখে। যোগিনী ও মৈথিলী। সেইসময় থেকে ওদের বাবা এক মহিলার কাছে যেতেন। বয়সে ওর পিতার চেয়ে সেই ভদ্রমহিলা বেশ কিছুটা বড়। মানসিক আশ্রয়। দৈহিক হয়ত ততটা নয়। আসলে একটা সময় মানুষ চিন্তাকে নোঙর করার জন্যে নীড়ের সন্ধান করে। চন্ডী মৈত্র এক মহিলাকে চিনতেন। ওর স্বামী ফিজিক্স পড়াতেন। ওর পত্নী অধ্যাপিকা ছিলেন তবে সংস্কৃতের। সেই ভদ্রমহিলাকে এই ভদ্রলোক মানে পতিদেব -নির্বোধ প্রমাণ করতে শশব্যস্ত ছিলেন। শেষদিকে মারধোর করতে শুরু করেন। কারণ মহিলা জার্মানিতে গবেষণা করার সুযোগ পান। এমনিতে

উনি বেশ মেধাবী , ন্যাশন্যাল স্কলার , যশস্বিনী হতে বাধা কোথায় ? স্বামীর হয়ত ইনসিকিউরিটি শুরু হয় । মহিলা নিয়ম করে পতির হাতে বেধড়ক মার খেতেন । কিন্তু চিন্তাকে লোঙর করার নীড় না পেয়ে শেষকালে উন্মাদ হয়ে যান । বাইপোলারের রুগী হয়ে দিন কাটান । বন্ধু বা বান্ধবী কেউ থাকলে সহজ হতে পারতেন হয়ত । দূর্ভাগ্য ওনার।

জীবন সব দিতে জানেনা নিতে জানে অনেক বেশি । নিজে যা শেখা যায়না সময় শিখিয়ে দেয় । জীবনের ইনভিসিবেল দিক যখন ঝড়ের বেগে আসে কেউ হারিয়ে যান কেউ ফিরে পান নিজেকে ।

যোগিনীর বাবার সাথী , উনি এক সাধারণ শিক্ষিকা । ওর বাবার এত বড় ব্যবসার সাথে তার কোনো যোগ ছিলোনা । একটু উষ্ণতার আশায় উনি যেতেন ওর কাছে । একটু আরাম , বিশ্রাম , শান্তির পরশ । পাখির নীড়ের মতন চোখ ও আকাশের মতন যার মন । সেই ভদ্রমহিলার পুত্র ওদের সৎ ভাই যাকে ওরা নিজের ভাই বলতো সেই কুন্দন এখন মালিক । তাই তো ভেঙে পড়ছে সব । সবাই বলছে । কুন্দন নাকি অসৎ । সৎ ভাই অসৎ -লাভের আশায় কুকর্ম করছে । ভেজাল মেশাচ্ছে । তাই ভেঙে যাচ্ছে স্থাপত্য । লোকে বলছে , শহরের আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে । সে অবিবাহিত । সংসার করেনি এখনও । তবুও লোভ আকাশ ছোঁয়া । যোগিনী ছিলো কর্মীদের কাছে মায়ের মতন । আশ্রয় , ছাদ । কিন্তু কুন্দন বিপরীত । সে তাদের শত্রু । আমেরিকা গিয়েছিলো মোদির সাথে । মোদি ওদের ম্যানেজার । মধুলিকা ওকে ছেড়ে গেলে সে এই কোম্পানিতে যোগ দেয় । যোগিনী ওর সহপাঠি হওয়ায় ওর মতন মেধাবী মানুষকে নিয়ে আসে নিজ কোম্পানিতে । ব্যবসা হু হু করে বাড়ে । মোদি এখন কামিনী কাঞ্চনে মেতেছে , কালীমাতা ছেড়ে ।

বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারও মোদিই দেখতো । শেয়ারের দামও বাড়ে । তবে যোগিনীর দয়ালু মনোভাব মোদির পছন্দ ছিলোনা । বলতো : তুমি বিজনেস করছো ।

অত মায়াবী হবার কী প্রয়োজন ? অনলি ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট । কথায় পুওর হবেনা । এমনভাবে কথা বলবে যাতে লোকে ভাবে তুমি দয়ালু আসলে নিজের ঘর গোছাবে ।

বিজনেস ইজ মানি । যেভাবে পারবে টাকা কামাবে । কেউ এখানে বন্ধু নয় । পেছন ঘুরলেই ছুরি মারবে । কাজেই সাবধানে থেকো ও প্রস্তুত থেকো পালটা আঘাত হানার । ডিগনিফায়েড বিজনেস ম্যান বলে আদৌ রিয়ালিটিতে কিছু হয়কি ?

দেখো স্যার রিচার্ড ব্র্যান্সনের মতন বিজনেস টাইকুনকে লোকে বলে কার্পেট ব্যাগার আবার রিউপার্ট মার্ডকের নাকি তেমন সুললিত ব্যাপার নেই ।

এটা খেলায় নয় যুদ্ধের ময়দান । অত সেন্টহুড দেখানোর দরকার নেই এখানে । এখানে কেউ মেসাইয়া নয় ।

হ্যাঁ শেয়ার হোল্ডারদের ইন্টারেস্টটা মাথায় রাখতে হবে । নাহলে কোম্পানি ডুবে যাবে ।

৪।

মোদির সাথে কুন্দনেরও ঠান্ডা লড়াই চলতো। মতের মিল হতনা। মোদি অ্যাগ্রেসিভ। কুন্দন ধীরে চলে। তবে লোকে এখন বলছে সে অসৎ। ধীরে চল নীতি কোথায় এখন ? ওসব লোক দেখানো ছিলো। চন্ডী মৈত্রের কেমন লাগে। ছেলেটিকে খুব কাছ থেকে কয়েকবার দেখেছে যোগিনীর বাসায়। মন্দ মনে হয়নি। দিলখোলা মনে হয়েছে। হাসিখুশি। শিক্ষিকা মায়ের একমাত্র পুত্র। বড়লোক বাপের কুপুত্র নয় সে। কিছু মূল্যবোধ তার মা ওর মধ্যে ভরতে পেরেছিলেন। যদিও বাবা ও মায়ের কখনো বিবাহ হয়নি তবুও ওর মাকে তার ব্যবসাদার পিতা স্ত্রীর মতনই সম্মান দিতেন। মেয়েরাও ওকে মা বলেই সম্বোধন করতো। যোগিনী ও মৈথিলী। ওয়েল ম্যানার্ড মেয়ে যুগল। চার্মিং ম্যানার্স এর জন্যে যারা সমাদৃতা। মোদি তো মারা গেলো আমেরিকায়। আবার গাড়ি দুর্ঘটনা। ডেনভারের দিকে। মুখ দেখে চেনার উপায় ছিলোনা। কুন্দন ও সে একসাথে যাচ্ছিলো। অ্যাক্সিডেন্টের পরে কুন্দন হাসপাতালে ছিলো অনেক অনেক দিন। পরে ছাড়া পেতে ও সুস্থ হতেও অনেক সময় লাগে। ড্রাইভারও মারা যায়। কুন্দন কেবল জীবিত বলে শোনা যায় এতদূর থেকে। ব্যবসা মোটামুটি সৎ পথে মোদির হাত ধরে যেমন এগোচ্ছিলো যদিও যোগিনীর মতন বিশুদ্ধতা-বাদী সে নয় তবুও -সেরকম কুন্দন ফিরে আসার পর থেকে আজ অসৎ পথে তরতর করে আরো এগিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু বাধা পড়লো পর পর বিল্ডিং ভেঙে পড়াতে। সরকার থেকে এখন তদন্ত হবে। আর শুধু এই তল্লাটে নয় দেশের আরো নানান কোণে এদের তো সব সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য

ভেঙে পড়ছে। ইট বালি সুড়কির ইমারৎ-এ কি জং ধরে গেলো? কেন ভেঙে গেলো সেইসব ? কত মানুষ মারা গেলো। তাই নিয়ে আজ দেশ উত্তাল। তন্ত্র কর্পোরেশানের সব অফিসে জটলা। কী হয় কী হয় বার্তা বাতাসে। চুপিসারে ভেসে আসে কিছু গুঞ্জন। পর্দা সরিয়ে। কর্মীরা ব্যস্ত কাজে , তারই মধ্যে। মোদি ও যোগিনী ছিলেন দুই স্তম্ভ। তাঁরা চলে যেতে কুন্দনের মতন অনভিজ্ঞ একজনের হাতে সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ায় এমনিতেই লোকে ত্রস্ত। তায় আজ ইমারৎ ধ্বংস হতে থাকায় লোকে ক্ষিপ্ত। কি দরকার ছিলো তাড়াহুড়ো করে একসাথে এতগুলো কাজ নেবার ! সবারই এক প্রশ্ন। এক এক করে প্রোজেক্ট করলে হতনা ?

লোভ ও লাভ এই দুই অঙ্কের কারণে কুন্দন এই স্টেপ নিয়েছেন সবাই একমত হলেন অবশেষে। কুন্দন এই কোম্পানিতে গুন্ডাবাহিনী পুষেছে। তারা কর্পোরেট গুন্ডা। কর্মীদের হ্যারাসমেন্ট এর হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তাদের। কেউ কর্মীদের উত্যক্ত করলে কিংবা জমিজাতি নিয়ে ঝামেলা পাকালে এই গুন্ডার দল গিয়ে তাদের উত্তম মধ্যম দিয়ে ঠান্ডা করে দিয়ে আসে।

লোকে টেরও পাবে না। ভাববে কোনো লোকাল রাউডি। আসলে তা তন্ত্র কোম্পানির পোষা গুন্ডাবাহিনী।

যোগিনীর আমলে এগুলি ছিলো না। মোদিও করেনি। কুন্দন এসেই এইসব আরম্ভ করেছে। বক্তব্য হল : আজকের দুনিয়ায় বাঁচতে হলে নিজেকে প্রটেক্ট করতে হবে। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ওদের কর্মীরা নিজেদের বাঁচাবে কি করে?

তাই এই গুন্ডার দল আসলে ওদের এসকর্ট। তাদেরই হিতার্থে এদের পোষা।

৫।

বিরাটনগরে অনেক চাষাভুষো। তাদের সব বিরাট ক্ষেত খামার। সবুজ সবুজ চাষের জমি। ফলন , খড় , আল , নালা , কাকতাড়ুয়া। জুই ফুলের গন্ধে মো মো করছে চারিপাশ। মেয়ে বৌরা বেণীতে কিংবা কবরীতে আলগা জুইয়ের মালা ছড়িয়ে চলেছে পথ বেয়ে। স্বর্গীয় আভা ও প্রতিবিম্ব। স্বচ্ছ জীবন যাত্রা।

ময়না টিয়া গাংচিল। ধানফুল কাশফুল চিতাই পিঠা , নারকোল নাড়ু। ধানকাটার গানে ভোরাই মুখরিত। ফিরতি পাখির কাকলিতে ঝরে পড়ে বৈকালিক সুধা। মোলায়েম পথ,টাটকা সবজি। দূষণহীন জল। বাতাস। কচিকাঁচার দল। এন জি ও - সদাব্যস্ত দরিদ্রনারায়ণ সেবায়। এখানে লোকের রুটি রুজি চাষবাস। এই রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তন্ত্র কর্পোরেশানকে দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্যে শিল্প স্থাপন করতে। ওরা সেই কারণে এই চাষার দলকে তাড়িয়ে কারখানা গড়তে ইচ্ছুক। চাষারা যাবেনা। ওরা বলে : ক্ষেতখামার থেকেও তো আয় হতে পারে। ওদের ভেতর যারা পড়ালেখা করেছে তারা আঙুল দেখায় : ঐ যে পাঞ্জাবকে দেখো। গ্রিন রিভোলিউশান। কত অর্থের আমদানি হবে।

অনেকে বলছেন : সবুজ বিপ্লব ফেল করেছে। ওতে ভালো কিছু হয়নি।

পরিবেশবিদরা নানান তথ্য দেন। তর্ক বিতর্ক হয়। মূর্খ চাষীরা বলে : আমরা অতশত জানিনা বাবুমশাইরা। আমরা ভিটে মাটি ছেড়ে নড়বো না।

আর কোথায় যাবে তারা ? সবুজ বনভূমি ফেলে , আবাসস্থল ফেলে কোথায় যাবে ? নতুন জায়গা বললেই যাওয়া চলে ?

এখানেই জন্ম , বড় হওয়া , খেলে বেড়ানো !

তারা যেতে রাজি হয়না । তন্ত্র কর্পোরেশানের পক্ষ থেকে অনেক টাকার প্রলোভন দেওয়া হয় । তবুও পিছুটান রয়েই যায় । ওরা বলে : আমরা যাবোনি !

মালিকেরা চিন্তিত । এতবড় কাজ পেয়েছে ওরা এবার এই গরীব গুর্বোগুলোকে না হটালে সব ভেস্তে যাবে । কাজেই কী করা ? সবাই মিলে ভাবতে বসলেন ।

এদিকে কুন্দনের হুকুম : বেশি দেরি করা যাবেনা । তাড়াতাড়ি যা করার করতে হবে । নাহলে সরকার এই কাজ অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারেন ।

জরুরি মিটিং হচ্ছে । চাষার দলের হয়ে লড়ছে এন জি ও । তন্ত্র কোম্পানি বলে : এদের আর কাজ কি ! কতগুলো অপোগন্ড যেগুলো কোথাও চাকরি পায়না কিংবা বড়লোকের অকর্মণ্য বৌ এসে এগুলিতে জোটে । যতসব বাজে ইস্যু নিয়ে লড়ে । বেশ্যার সতীত্ব বা সামাজিক সম্মান , দরিদ্রদের অভিজাত স্টেটাস , মূর্খের লিটেরারি প্রাইজে অধিকার , যতসব ! কোম্পানির লোকের মতে -এরা বাড়ির খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় !

এখানে শিল্প হলে কতো লোকের চাকরি হবে । বেকারত্ব ঘুচবে নুইয়ে পড়া রাজ্যে । তা নয় এই এন জি ও লেগে পড়েছে শিল্প বন্ধ করতে । এন জি ও অবশ্যি বলছে : অন্যত্র কোম্পানি গড়তে । অন্য খোলা জায়গায় । কিন্তু সেখানে নানান অব্যবস্থা । রেল, ফুয়েল , সড়ক ইত্যাদির সুলভতা নেই কাজেই ! তন্ত্র কোম্পানির মানুষ এখানে ঘাঁটি গাড়তে চায় , গড়তে চায় নব ইমারৎ ও কারখানা সমস্ত একসাথে ।

৬।

কুন্দনকে খারাপ মনে হবে কেন চন্ডী মৈত্রের ? একদিন সে যোগিনীর বাড়ি বসেছিলো। বাগানে। বিশাল বাগানে। শাল পিয়ালের বনে। চা পানে মত্ত সবাই। সেইসময় একজন দরোয়ান এসে বললো যে একেবারে গরীব একটি গ্রামীণ মহিলা দেখা করতে এসেছে।

যোগিনী একজনকে সকালে করে সময় দেয় দেখা করার জন্যে। এরা সবাই সাধারণ মানুষ। তাদের কিছু করে টাকা দিয়ে দেয় সে। রোজই আসে তারা। আজ এই মহিলা এসেছে। বহুদূর থেকে এসেছে সে। অন্দরে নিয়ে এলো দরোয়ান। চন্ডী মৈত্র দেখলেন : একটি ছেঁড়া খোড়া মা। বয়স্ক। পরণে একটি ছালার মতন কিছু। শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য। হাতে একটি মাটির কলস। খুবই রুগ্ন ও দু:স্থ।

চুল এলোমেলো। পাকা চুলই বেশি। কানে দুল নেই। নাকে একটি ছোট নাকছাবি। ঝকঝক করছে , হয়ত পেতলের। খালি পা। হাত খালি। মুখে অমল হাসি। যোগিনীর দিকে এগিয়ে দিলো কলসী। তাতে ওর বনের মধু। থাকে পর্ণ কুটিরে। বন থেকে বুনো মৌমাছি সৃষ্ট মধু চাক ভেঙে সংগ্রহ করে এনেছে ! খালি পায়ে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে।

যোগিনী শুধায় : এগুলো আনলে কেন মা ?

- খালি হাতে কি আসতে পারি মেয়ে ?

হতদরিদ্র মহিলাটির আভিজাত্যে মুগ্ধ চন্ডী। দুই চোখ জুড়িয়ে গেলো। শহুরে পণা দেখে দেখে ক্লান্ত উনি। এ যেন এক ঝলক দমকা হওয়া , চেতনাকে শুদ্ধতায় ভরিয়ে দিয়ে গেলো। কোন এটিকেট ও ফিনিশিং স্কুলে পড়েছে এই মহিলা ? কে শিখিয়েছে শিষ্টতার বুলি একে ?

কুন্দন সেদিন এঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলো। আর যাবার সময় মূল্যবান কিছু শাড়ি ও গহনা দিয়ে বলেছিলো : আমার এক মাকে দিলাম।

দিনটি ভুলতে পারেন নি চন্ডী মৈত্র। সবার অগোচরে মনে মনে উনি প্রণাম জানান এই মহিয়সীকে। আজকের কুন্দন যার কথা লোকমুখে শোনেন ও কাজ দেখেছেন তার সাথে সেই কুন্দনের কোনো মিল নেই। সত্যি মানুষ বদলে যায়। সীমারেখা যেমন ঘুচে যায় সেরকম বদলায় তটরেখা। সমুদ্র ফেনিল হতে হতে বদলে দেয় সমস্ত সুক্ষ্ম লাইনগুলি। মানুষ মনে মনে রঙীন থেকে সাদা কালো হয়।

৭।

কুন্দনকে কিন্তু আরো একবার দেখেছিলেন ঠিক এইভাবেই। মানুষ রূপে। তখন ছিলেন হরিগাঁও বলে একটি জায়গায়। সেই ছবিশঙ্করের ধ্যান আশ্রমের ক্রিয়া অনুষ্ঠানে। যোগিনী ও কুন্দন গিয়েছিলো। সেখানে একটি আদিবাসী গ্রাম আছে। তারই পাশে একটি অস্থায়ী আশ্রমে ব্যবস্থা। আশ্রমের যে জলের ব্যবস্থা সেখান থেকে একটি কুষ্ঠরুগীকে জল খেতে দিলে না কয়েকজন কর্মী। ভয়ে। ছোঁয়াছুঁয়ি। যদি রোগটি তাদেরও হয়ে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন চন্ডী। তারও যে ভয় ছিলোনা তা নয়। তবে উনি ভয় কাটিয়ে এগিয়ে যাবার মনোবাসনা রেখে ছিলেন কিন্তু এগিয়ে যায় কুন্দন।

অতবড় কোম্পানির মালিকের একমাত্র পুত্র সে। অথচ কোনো জড়তা নেই পদচারণায়। স্মার্ট , সাবলীল তার ভঙ্গী। এগিয়ে গিয়ে বৌদ্ধ্য শ্রমণের মতন আঁজলা ভরে জল পান করালো সেই রমণীকে যার নাকের ফুটো গলিত। কুষ্ঠে। নিদারুণ চেহারা , ভয়ানক , শঙ্কা হয়। তাকে জলপান করালো কুন্দন। অবাক জলপান। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এক শ্রমণ যেন শান্তির বারি দিচ্ছেন ক্রমাগত এক পিয়াসী আত্মাকে। যাকে ছুঁতে ভয় সো কলড্ আশ্রমের মানুষদেরও।

সেই মানুষই আজ পরিচিত ঠগ , জোচ্চোর হিসেবে। হাসলেন চন্ডী। জীবনে জানার কোনো শেষ নেই। পুরো জীবনটাই একটি পুস্তক। শিক্ষা। অজানাকে জানার অচেনাকে

চেনার। উনি অবসরপ্রাপ্ত অফিসার নন। নিজেকে বলেন : স্টুডেন্ট অফ লাইফ। লাইফ ইজ আ জার্নি। প্রতিটি সেকেন্ড শিক্ষা দেয়।

ধৈর্য্য , নিষ্ঠা আর বিশ্বাস এই কটি চলার পথের পাথেয়। আজ সায়াহ্নে এসে মনে হয়। পরিস্থিতি বদলে যায় , দুর্দিন থেকে সুদিন আসে কিন্তু কটু কথা থেকে যায়। সেরকম কোনো কোনো ঘটনা মনের কোণে ছায়া ফেলে যায়- মানুষও কেমন বদলে যায়।

যত দেখছেন তত শিখছেন , যেদিন অবসর নিয়েছিলেন ভেবেছিলেন সব শেষ। এখন কেবল মৃত্যুর পদধ্বনির প্রতীক্ষায় দিন যাপন। আজ বুঝতে পারছেন সেদিন শুধু শুরু হল নতুন একটি অধ্যায়ের। যা এতদিন কাজের চাপে চাপা পড়েছিলো। ওদের ধ্যানের ওখানে একটি ছেলে আসে। সে ক্যান্সারে আক্রান্ত। কেমো নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। চীৎকার করে কাঁদে। বলে : বাবাজী , আমি বাঁচতে চাই ,আমাকে বলতে পারো কী করে বাঁচা যায় ?

চন্ডী মৈত্রের মনে পড়ে যায় মেঘে ঢাকা তারা সিনেমার কথা। বাবাজী অর্থাৎ ছবিশঙ্কর ওকে জীবনের গান শোনান। কিন্তু ওরা সবাই জানেন এ মিথ্যে। চরম মিথ্যে। সাধুর মুখে অসত্য বাণী। সাধু ছবিশঙ্কর ও সাধ্বী ঋতা অনর্গল মিথ্যা আশ্বাস বাণী দিয়ে যাচ্ছেন ওকে। সারা দুনিয়া জানে এসব মিথ্যে। ও কিছুদিন পরেই বাতাসে মিলিয়ে যাবে। ক্যান্সার সারেনা। লাস্ট স্টেজ। স্টেজ ফোর। ওর সারা দেহে ছড়িয়ে গেছে। তবুও ওঁরা ওকে জীবনের গান শোনান। কারণ ওঁরা বলেন জীবনের শেষ নেই। আমরা স্পিরিট ইন হিউমান বডি। মৃত্যুর পরে আছে স্পিরিট দুনিয়া। আমরা ওখানে চলে যাবো। আত্মা মরেনা।

অমৃত আমরা। অমৃতের সন্তান। ক্যান্সার তো শিশু। দেহ যায়। চেতনা থেকে যায়। ওকে ওঁরা এইভাবেই সাহস দেন। আর অশ্বগন্ধা খেতে দিয়েছেন। তাতে ও বেশ শক্তি পেয়েছে।

গল্প শুনেছেন উনি : কোন সে এক চৈনিক সম্রাট মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। সেখানে ওঁর প্রায় দিন ঘনিয়ে আসাতে উনি ভেঙে পড়েন কারণ উইল করা হয়নি। শেষে চিকিৎসকেরা ওঁর দেহে অশ্বগন্ধার কোনো বড় ভাইকে প্রয়োগ করেন। তাতে উনি উঠে ছুটে একেবারে উইল বানিয়ে ফেলেন। পরে মারা যান।

এই ছেলেটিকেও ওঁরা অশ্বগন্ধা দিয়েছেন। এনার্জির জন্যে।

৮।

তন্ত্র রুদ্রানী কর্পোরেশানের শর্ট ফর্ম টি সি ; টি আর সি নয় । এরা অনেক জায়গায় অট্টালিকা নির্মাণ করেছে । সেইসব জায়গায় বন জঙ্গল দূর থেকে দূরান্তে সরে গেছে । গাছপালা নেই । চারিদিকে কেবল কংক্রীটের মেলা । ইঁট কাঠ পাথরের সারি । তাই পরাগরেণু নেবার লোক নেই ।

মধু আহরণ করার লোক নেই । মৌমাছির অভাব । তারা তো বনে ! কাজেই রেণু নেবার ভ্রমরা নেই ! মানুষ আছে তবুও । এরকমই এক স্থানে - টিমি নাম তার । টিমি চ্যাং । সুদূর চীন দেশ থেকে এখানে জলপরিপুরে এসেছিলেন ওর বাবা ও মা । কাছেই শান্তিনিকেতনে চৈনিক নাটক নিয়ে অধ্যাপনা করতেন । পুত্র বীরভূমের জলপরিপুরে মৌমাছির চাষ করে । সে অর্থের বিনিময়ে মৌমাছি ভাড়া দেয় । ক্ষেত খামারে তার পোষা মৌমাছি নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দেয় । তারা রেণু , মধু টুধু যা হয় নিয়ে ফিরে যায় । তারপর বাক্সবন্দী হয়ে যায় মালিকের কোলে করে গৃহে । মালিক এর জন্যে টাকা পান , এই ওর রুটিরুজি । টিমি ভারি ভালো ছেলে । অবসরে ডিসেবেলদের একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ায় । ওরা নানা নিউরোন সংক্রান্ত রোগে কাহিল । আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর মতন । টিমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রায় পিতৃ স্নেহে ওদের লালন করে । ওর মৌমাছির মতন ।

এক সাঁওতালি মেয়েকে বিহা করেছে। সে আবার কালোমণি নামের মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান গায়। তাকে নিয়ে এক নামী ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন। কালো রঙের পাথরে মূর্তি। ন্যুড স্টাডি নয়, এ হল প্রকৃতি। রমণীর অবয়ব। ছায়াশরীর। যা ধারণ করেছে স্রষ্টার ঔরস। সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী, মানুষ, পশুপাখি। কালোমণি ভাবায়, নাড়া দেয়। ভাঙে, গড়ে। ও বিমূর্ত, মেটাফোর। ও নারী নয়। টিমির মৌমাছি নয়। ও ছায়ামানুষী। সৃষ্টিকর্তার ঔরস ধারণ করেছে যে। সৃষ্টিকর্তা তো শূন্য তাই কালোমণির বিন্যাস ছায়ায়। ইমোশান্স ওঠে নয়, গর্ভে। টিমির দিন কাটে সাঁও-তালে ও মৌমাছির সঙ্গে টিমে তালে। অথবা কোনো খেয়ালি বসন্তের তালে তালে।

৯।

কালোমণিকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিলো যা সফল হয়েছে। ওকে নিয়ে টিঁমি এক অচিন মরুতে ঘুরেছে। কালোমণি পড়াশোনা শিখেছে। বাংলায় বি এ পাশ। টিঁমি সাঁওতালি শিখেছে। মেয়েটি ভারি সরল। ইনোসেন্ট। ইনোসেন্স আজ হারিয়ে গেছে জগৎ থেকে তাই তো এত সমস্যা। কালোমণিরা ঝাঁক বেঁধে আসুক আরো। মনে মনে ভাবে টিঁমি চ্যাং। কালোমণি চ্যাং। ওর পুরো নাম। নামটা শুনলে খিল খিল করে হাসে মেয়ে। বলে : আমার নাম আসলে কালোমণি চ্যাংদোলা।

টিঁমি বলে : দোলাটা আমি তোমায় আদর করে ডাকবো। তোমার নাম কালোমণি চ্যাং আর দোলা আদরের নাম। মাঝে মাঝে একটু দোলও দিয়ে দেবোখন। দোলনায়। আমাদের বাগানে। দোলপূর্ণিমায়।
আবার হেসে ওঠে মেয়ে।

ওর বাবা মাকে ও আবার তুই করে বলে। ওরা আদিবাসী তো। যেমন মারাঠিরা মাকে তুই বলে। টিঁমি অবশ্য ওকে বলেছে যে আমাকেও তুই করে বলতে পারো।
তুমিটা খুব ফর্মাল।

ওরা বাংলায় কথা বলে মাঝে মাঝে আবার সাঁওতালিতে বলে। টিঁমি ওকে চৈনিক শেখায়। ও বড় বড় চোখ মেলে বলে : এতো গুলো অক্ষর ?

- হ্যাঁ , ১০ লাখের বেশি বই কম নয় !
- দ-ও-শ লাখ ? চোখ জোড়া ছানা বড়া কালোমণি চ্যাংদোলার । মনে রাখো ক্যামনে?
- -জ্যামনে তুমায় চ্যাংদোলায় দোলাই ! হাসে ওর দোসর ।

টিঁমি বাংলা পড়েছে । ছোটবেলা থেকেই এখানে আছে ।

সেই মরুভূমিতে ওরা ছিলো কয়েক সপ্তাহ । সেখানে এক যাযাবর প্রজাতি আছে । তাদের তাঁবুতে থাকতে হয় কারণ কোনো হোটেল নেই । গাঢ় মরুতে উটের পাল । দূরে মরূদ্যান। সূর্যাস্তের সময় ঘন দুধের চা পান করতো শিবিরে বসে ময়ূখমালির লালিমা মেখে । সে এক অনাবিল দৃশ্য । অপার্থিব সময় । সোনালী বালি , লাল আবীর আকাশ , দূরে উটের পাল , বেদুইন মানুষের হাতে অচেনা চায়ের মৌতাত সে এক স্বর্গীয় ক্ষণ । আর পাশে প্রেয়সী , সাঁওতালি মেয়ে , রুনুঝুনু পায়ে চলে - কালোমেয়ে- তুই কেন নাচিস নে রে কালোমণি ?

কালোমণি আমি তারেই বলি , সোনালী তারে বলেনা কেউ - নীল চোখে তার হরিণ আভাস , পিঠে ছড়ানো মুক্তকেশের ঢেউ !

বাংলায় দুইছত্র লিখে ফেলেছিলো টিঁমি সেই মরূদ্যানের কাছে বসে । কাছের মানুষের তরে !

ফেরার সময় সেইদেশের পথে ওরা ঐদেশের লোকের ঈশ্বরের নাম নিয়ে ফেলে যা কিনা ওদের ধর্মের অনুসারে বারণ নাহলেও সরকার থেকে আইন করা হয়েছে যে বিধর্মীরা উচ্চারণ করতে পারবেন না । ওরা জানতো না । কিন্তু অজ্ঞানতা কোনো ক্ষমা পাবার রাস্তা হতে পারেনা । তাই দুজনকেই ফাঁসি দেওয়া হয় ঐ মরুশহরের নিয়ম মাফিক । খুবই ক্ষুদ্র জনপদ । ওদের এক মহা নরেশ বিরাজমান । ওরা যখন তখন পোষা উট , কুকুর , ছাগল , গরু মোষ এদেরকেও মেরে ফেলে ।

একটু নির্মম জাত আর স্পর্শকাতর। তাই নাম দেওয়া গেলোনা। তাহলে মুন্ডচ্ছেদ হতে কতক্ষণ ?

বিদেশের অনেক জায়গা আছে যেখানে আজও কালোমানুষ প্রবেশ করলে সাদালোক প্রতিবাদ করেন। হৈ চৈ বাধান।

আমাদের অঞ্জন দত্তের গানের মতন :

বংশের ইজ্জৎ রাখতে হলে বৌ হতে হবে ফর্সা ; বাঙালীর ছেলে তাই গলায় গামছা দিয়ে ফেললাম করে বিয়ে , ছোট্টবেলার প্রেম আমার কালোমেম কোথায় গেলে হারিয়ে!

ওখানে রং নিয়ে বিরোধ , এখানে ধর্ম নিয়ে। মানুষ মানেই বুঝি বিরোধ ? একটু প্রেম ঢালো না হিংসায় তোমরা ! ওগো ও ফেরিওয়ালা ! তুমি প্রেম বিক্রি করো ? আমাকে দেবে ?

১০।

মৈথিলী তার একমাত্র দিদির মৃত্যুর পরে অবসাদ রোগের কবলে পড়ে। বিষাদ কন্যা হয়ে যায়। নানান ওষুধ বিষুধ খায়। সাইকো সোমাটিক ড্রাগ্স। তারও সাইড এফেক্ট অনেক।

দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটাতে থাকে। বিকেলে ঘুম ভাঙে। উঠে চা খায়। জলখাবার খায়। তারপর রিমোট নিয়ে টিভির চ্যানেল ঘোরায়। শফারকে নিয়ে বার হয়। কোনো অভিজাত কফিশপে। পেজ থ্রি সার্কেল। নাহলে কোনো এক্সিবিশান, সিনেমা, ফ্যাশান শো। এইভাবেই কাটে দিন তার। ফিরে এসে শুরু হয় মদ্যপান। চলে গভীর রাত অবধি। সেইসময় ও কাউকে মারধোরও দিতে পারে। কার্স করে গড়কে। অন্যান্য দের। যারা সুখী। ওদের সার্কেলে। মিসেস চ্যাট বলে একজন আছেন তাকে দুমাদুম গালি দেয়। মহিলাটি ধান্দাবাজ নি:সন্দেহে। তার দুই ছেলেমেয়েকে সমাজের শিখরে তুলে দিয়েছে। নিজেও যোগ্যতাহীন হয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে। মৈথিলী বলে : কৈ ওর পরিবারে কেউ তো মরেনা ! আমার বাবা, দিদি, মা, মমি (বাবার মিস্ট্রেস, কুন্দনের মা) সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

কখনো কখনো শহরের পশ নিঝুম রাস্তা থেকে মেল সেক্স ওয়ার্কার নিয়ে আসে। সারারাত খেলে। ভোর হলে তারা ফিরে যায় মোটা টাকা হাতে, গোঠে।

- নিজেকে এইভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছো কেন মৈথি ? প্রশ্ন করেছিলেন চন্ডী।

ওর কথা কেন জানি সে শুনতো। গার্ডিয়ান ভাবতো। বলে : গড আমাদের পরিবারকে ডেস্ট্রয় করেছে , তাই আমি নিজেকে। সিম্পেল , লজিক।

- তুমি মিউজিকে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলো ! এত ভালো সেতার বাজাও ! কজন পারে? সুরের সমুদ্রে ডুবে গেলে সব ভুলে যাবে !

এবার জোরে জোরে হাসে সে। চোখে তার বিজুরি , মুখে বিদ্রুপের হাসি : মিউজিক মানে গড। আই হেট গড। শেষের কথাটা খুবই জোরের সাথে বলে , এবং বিশ্বাসের সাথে। আজ সেই মৈথিলী বা মৈথি মিঠি মিঠি হাতে হঠাৎ সেতার বাজাতে বসেছে। একটু হতবাক , চন্ডী। আমাদের আদি, অকৃত্রিম চরিত্র : চন্ডী মৈত্র !

খুব সুন্দর সুর ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ঐশ্বরিক লাগছে সব। মৈথিলী বড় মায়াবী। চন্ডী অত শব্দ জানেন না , স্পর্শ বোঝেন। সুরের স্পর্শ খুব মিহিন।

১১।

টিসি সংস্থার একটি বিভাগে ইদানিং শিশু শ্রমিকেরা কাজ করে। সেই খবর কেউ জানেনা। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ধরে এনে কাজ করানো হয়। বেশির ভাগই আসে বস্তি থেকে কিংবা পথশিশু। খাবারের লোভ দেখিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে এনে আটকে রাখা হয় তারপরে কাজ করানো হয়। উঁচু উঁচু দেওয়াল। পালাবার পথ নেই। কয়েদ খানার মতন। সেখানে রোজ সকাল হয় , আবার সূর্য অস্তও যায়। কিন্তু কচি কচি মুখগুলিতে আসেনা কোনো পরিবর্তন। ওরা একমনে কাজ করে যায়। পাথর ভাঙা। লোহা ভাঙা। অনেক কম টাকায় কাজ কিংবা বিনা খরচে কাজ হয়। শুধু খাবার দিতে হয়। বছরের কিছু সময় এরাই অনাথ আশ্রমের বাসিন্দা হয়ে যায়। ডোনেশান আসে। যখন সংস্থা পরিদর্শনে আসে বিদেশীরা। তখন কুন্দন ডাউন টু আর্থ। সাইকেলে কিংবা হন্টন করে ক্যাম্পাসে ঘোরে। অন্য সময় দামী বিদেশী গাড়ি। কাবাব লাভাস, বঙ্গানি রুমি পুলাউ।

এই কোম্পানিতে বিনোদনের জন্যে রূপসী নারী আনা হয় যারা সমকামী তাদের জন্য একই সেক্সের মানুষ আসে। যেই ছেলেটি এই কাজ করে তার নাম জনি। আসল নাম জয়ন্ত বিষ্ণু বসু। যোগিনীর খুব কাছের লোক ছিলো। সে তাকে খুব স্নেহ করতো। যোগিনীকে ও দিদি সম্বোধন করতো। যদিও কোম্পানির লোক তবুও সে কৈশোর থেকে ওদের পরিচিত। দিদিদের চেনে। ওস্তাদ ছেলে। তুখোড়। আগে দক্ষিণ ভারতে প্রখ্যাত

আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। সেখানে গিয়ে কোকেন , গাঁজা ইত্যাদির নেশায় পড়ে যায়। পড়াশোনা মাথায় ওঠে। পরে এখানে এসে কোম্পানি জয়েন করে। ও সেলসের দিকটা দেখে প্লাস এই কাজটিও করে।
জীবন্ত ছেলে। খুব প্রাণবন্ত। সবসময় হাসিখুশি। কাজ যাই করুক মনটা নির্মল।
বলে : চণ্ডী কাকু সংসারে থাকবেন পাঁকাল মাছের মতন , জলে পদ্মপাতার মতন। গুণীজন বলে গেছেন না ?

মৈত্রবাবু মৃদু হাসেন। এই জন্যি আবার মৈত্রকে কাকু বলে কিন্তু বন্ধুর মতন মাঝে মাঝে বাড়িতে ডেকে ভোজ খাওয়ায় , স্বপাক আহার ব্যাবস্থা। বার্বিকিউ , লা জবাব বিরিয়ানি, ভুনা খিচুড়ি , দম আলু , কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ দুধের অগ্র ঘোলের শেষ ! ডাল তড়কা , মূর্গ মাখানি , হাঁসের ঠ্যাং এর রোস্ট। ফিউশান ফুড ও বানায়। সম্বর ও পাস্তা , বিরিয়ানিতে নিউট্রেলার টুকরো , ম্যাগিতে কচি পাঁঠার শুকনো কারি এইসব। ছোকরা রাঁধে বেশ। বাঙালি মুখগহ্বর ও জিহ্বা।
খানার বেলার মৈত্র কাকু শৌখিন। এই একটি বস্তুই জীবনে করেছেন , প্রাণভরে।

১২।

জনি একদিন মৈত্র কাকুকে নিয়ে গেলো সেই সাইটে যেখানে টিসি কোম্পানি চাষাদের জমি দখল করে ইমারৎ ও শিল্প গড়ার পরিকল্পনা করেছে। সেইসব এলাকায় গিয়ে উনি দেখলেন কি ভীষণ সবুজে ভরা চরাচর। এক অদ্ভুত নীরবতা চারিদিকে।

বাতাসে যেন বারুদের গন্ধ। লোকেরা খুব চুপচাপ। যেন কার্ফু জারি হয়েছে। সবাই কাজ করছে কিন্তু চুপিসারে। ফলন ভালই হয়েছে। ক্ষেত ভরে গেছে সবুজে, হলুদে, সোনারঙে। মাদুর বিছিয়ে বৌ ঝিয়েরা কচি গাজর বা মূলো নিয়ে বসেছে। কেউ মটরশাক বিক্রি করছে। কেউ আলু , ফুলকফি , বেগুন। সাইকেল ভ্যান নিয়ে মেয়েরা চলেছে বাজারের দিকে ক্ষেত থেকে সবজি ভরে নিয়ে।

পাখির কলকাকলি। নদীর ঢেউয়ের গান। বড় বড় লাল রাস্তা , লাল রঙা পোড়া মাটির ঘর , দালান , বাজার , গ্রামের হাট , কুমোড় , মাটির ঘড়া , সরা , কলসী , গ্রামীণ মেয়ে বৌরা। পুরুষেরা। মিঠেল ছোঁয়া কিন্তু সব কেমন নি:স্তব্ধ। যেন সব আছে কিন্তু জাদুকাঠির ছোঁয়ায় কেউ রাজকুমারীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।
কেমন লাগে চন্ডী মৈত্রের। প্রশ্ন করেন জনিকে। এরকম কেন ?

সে বলে : ঐ আর কি। গরীব গুর্বো সব। ভিটে মাটির টান। ছাড়তে প্রাণ চাইছে না আর কোম্পানিও ছাড়বে না। তাই।

- কিন্তু ওরা অন্যত্র জমি নিচ্ছেন না কেন ?

- এখানে বহু সুবিধে। অন্য জায়গায় অত সুবিধে নেই।

- যোগিনী থাকলে এরকম হতনা।

- হ্যাঁ। দিদি বুঝতেন। দিদি খুব কমপ্যাশনেট ছিলেন।

- কিন্তু কুন্দন কেমন বদলে গেছে দেখেছো ?

- লক্ষ্য করেছি। কেমন নয় অনেক , অনেক পাল্টে গেছে দোদো (দাদাভাই কে ও দোদো বলে)। অল্প হাসে। তারপরে বলে : বদলের আরেক নামই তো জীবন। একমাত্র পার্মানেন্ট জিনিস হল চেঞ্জ। লাইফে। আফটার অল এরা তো বিজনেস ম্যান। এদের লাইফ হল বিজনেস। টাইম ইজ মানি , মানি ইজ টাইম। কী বলেন ?

- তা যা বলেছো। কুন্দনকে অন্যরকম ভাবতাম। কিন্তু দেখো এখন যোগিনী ও মোদি কেউ নেই অথচ সব কেমন বদলে ফেলেছে। নিয়ম কানুন , কোম্পানির এথিকস্।

১৩।

নেপালে টিসির অফিস আছে। সেখানে সোফিয়া নামে একটি মেয়ে কাজ করতো। ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন নিয়ে পড়ে নেপালে চলে এসেছিলো এক নেপালি সহপাঠীকে বিয়ে করে। অফিসে কাজ করতো হিউমান রিসোর্স বিভাগে।

মেয়েটি সেখানে এক নামী জ্যোতিষীর কাছে অ্যাস্ট্রোলজি শিখে এখন জ্যোতিষ করে। আন্তর্জালে একটি সাইট খুলে রিডিং -ও দেয়। খুব জনপ্রিয়। যেই ছেলেটিকে বিয়ে করে ও এখানে এসেছে সে কেমিক্যাল বিজ্ঞানী। নিজেদের নেপালে কারখানা আছে। কেমিক্যালের। পরিবারটি অবশ্যই সিন্ধুলে চাষবাসে নিযুক্ত ছিলো। ওখানে এখন ওরা মাঝে মাঝে থাকে। আমেরিকায় এই মেয়েটি দর্শন পড়তো। একই কলেজে বলেই প্রেম হয়। দেহে মজে। একটি বাচ্চা জন্মায়। তখন নেপালে এসে বাসা বাঁধে। এখন পেশাদার জ্যোতিষ। খুব নাম হয়েছে। হাত খুব ভালো। দেশ বিদেশ থেকে লোকে ওর সাথে টেলিকনফারেন্স করে। ঘন্টায় ও ৫০০০ টাকা নেয়। নেপালী মুদ্রায়। এই মেয়েটি চন্ডী মৈত্রকে বলেছিলো যে তন্ত্র কোম্পানিতে দুই মাথার একদিন বিপদ হবে। তবে এরা ঠিক কারা তা সে বলেনি। শুধু হেসেছিলো। বলেছিলো : ওটা রহস্য থাক। ভবিষ্যৎ বলবে। জীবনের আরেক নামই মিস্ট্রি। ম্যালেফিক গ্রহ রাহুর একটি মিস্ট্রিরিয়াস প্লেসমেন্টের জন্যে আমি আজ এই পরবাসে।

যখন যোগিনী মারা গেলো আর মোদির দূর্ঘটনা হল ও কুন্দন ফিরে এলো তখন চন্ডী বাবুর সোফিয়ার কথা খুব মনে হত। মনে হত একবার গিয়ে মেয়েটির সাথে দেখা করে সব খুলে বলতে। আবার মনে হত যে ও নিশ্চয়ই সব জানে কারণ ও তো তন্ত্র কোম্পানির খবর জানতেই পারে খবরের কাগজ মারফৎ। ওদের নেপালে কি আর এইসব খবর প্রকাশ করা হয়না ? ওখানেও তো বিরাট অফিস আছে। কত বিল্ডিং আছে ওদের। এয়ার লাইন আছে। তবে ছোট বিজনেস। ছোট প্লেন। যোগিনী সবসময় নাকি বলতো যে বিজনেসের একটা সোসাল রেসপন্সিবিলিটি আছে। সামাজিক দায়িত্ব। শুধু প্রফিট করলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে - মঙ্গল করার দিকেও নজর দিতে হবে। দু:স্থের , আর্তের সেবা। সমাজ সেবা। এগুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার। বিজনেসের অ্যাকাডেমিক্রেও এগুলো পড়ানো হয়। লাভ না দেখে দায়িত্বের দিকে খেয়াল রাখো। সোসাল রেসপন্সিবিলিটি অফ বিজনেস।

যোগিনী নিজেও প্রচুর সামাজিক কাজ করতো। সে ছিলো ডিগনিফায়েড বিজনেস ওম্যান। গবেষণাকে উৎসাহ দিতো। ওদের মূল ব্যবসা কন্সট্রাকশানের। অনেক স্থপতিকে ওরা বিদেশে পাঠিয়েছে গবেষণা করে এসে নতুন নতুন স্থাপত্য তৈরি করতে যা পরিবেশের সাথে সমতা রক্ষা করবে। পরে তো ব্যবসা আরো বড় হল। তখনও ও গবেষণায় উৎসাহ দিতো। মেধাবী টেকনিক্যাল বহু ব্রেনকে ওরা সাহায্য করেছে পেটেন্ট করতে। ইলেকট্রনিক্স ও সফটওয়্যারের দিকেও।

-ইনোভেশান নাহলে সমাজ এগোবে না , এই ছিলো যোগিনীর নিজস্ব বক্তব্য।

ব্যবসার ক্ষেত্রে এথিকসের দিকে নজর দিতো। কিন্তু এখন সব অন্যরকম হচ্ছে।

১৪।

সোফিয়ার কাছেই শুনেছিলেন চন্ডী বাবু যে সে শৈশবে খুব একা ছিলো । মা অনাথ আশ্রমে মানুষ । পরে আশ্রমের এক শেফের সাথে লিভ ইন রিলেশানে যান । তখন ছোট্ট সোফির জন্ম হয় । কিন্তু তার বাবা কিছুদিন পরেই মারণব্যাধি এইডসের শিকার হন । অসভ্যতার ব্যাধি । একটি সময় উনি হিপি ছিলেন । বহু নারীতে গমন করেন । সেইসময় এই রোগ দেহে বাসা বাঁধে । হয়ত অসুখ ডর্ম্যান্ট স্টেটে ছিলো ।

উনি মারা গেলে ভদ্রমহিলা আর শিশু সন্তানকে বড় করার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হননা । কারণ উনি খুব গরীব হয়ে যান । অনেক দেনা ছিলো । শোধ করতে হল । শেষে উনি মদ্যপ হন ও মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হলেন । জীবন কাটে মানসিক হাসপাতালে । ভায়োলেন্ট হয়ে যেতেন । সোফিয়াকে ওর প্রতিবেশি অর্ফানেজে দিয়ে আসে । একটি পরিবার ওকে দত্তক নেয় । ওরা ইতালির মানুষ , রোমান ক্যাথলিক । নিজেদের বড় বড় ছেলেমেয়ে ছিলো ওদের । সোফি ওখানেই মানুষ । সেখান থেকে কর্ণেলে পড়া ও নেপালি ছেলে হেমরাজের সাথে আলাপ । হেমরাজ খুবই ভালোমানুষ । খুব ডাইনামিক । সোফিকে খুব শ্রদ্ধা করে । ও অনাথ বলে কোনো কটুক্তি করা কিংবা অবহেলা করা এইসব করেনি কোনোদিন । ওর পরিবারও সোফিকে যথেষ্ট সম্মান দেয় । সিঙ্কোলিতে ও মিসেস হেমরাজ পেখম লামা । ওদের পারিবারিক নাম অনুসারে ।

অর্ফানেজে সোফি বেশ কয়েকবার চুরি করেছিলো ও পাকা চোর হয়ে ওঠে। চন্ডী মৈত্রকে বলেছে , কারণ আগেরদিকে ওর খুব রঙীন ক্লিপ লাগাতে ইচ্ছে হত। কিন্তু কেনার উপায় ছিলো না। তখন একজন বড় দিদির ক্লিপ চুরি করে লাগায়। পরে বহু চুরি করে বেধড়ক মার খায় টিচারের কাছে। খুব মন খারাপ হয়ে যায়। তখন থেকেই ওর একটি বাসনা জন্মায় জানার কেন সবার জীবন এক রকম হয়না। কেন ও অনাথ আর আরেকটি মেয়ে সুখী ও ধনী। কী এর পেছনে। ধীরে ধীরে অ্যাস্ট্রোলজির বই পড়তে শুরু করে। পরে বড় হয়ে রীতিমতন চর্চা। পেশাদার জ্যোতিষি হওয়া। সৌভাগ্যের কথা যে হেমরাজ পেখম লামা এতে বাধা দেননি। বরং তার ব্যবসার অর্থ দিয়ে ওয়েবসাইট খুলে দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। দরিদ্র নেপালিরা দলবেঁধে ওর কাছে আসে। নেপাল তন্ত্রের দেশ। মন্দিরের দেশ। ওরা এসব খুব মানে। লজিক ও সায়েন্সের শক্ত ছোবল ওদের সরল বিশ্বাসকে গ্রাস করেনি।

ও কোনো কোনো ক্লায়েন্টকে প্রয়োজনে পশু দান করতে বলে। যেমন কোনো কোনো গ্রহের কোপে পড়লে গো দান কিংবা ছাগদান ইত্যাদি। সেগুলি আজকাল নাকি আন্তর্জালের মাধ্যমেই করা যায়। অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে এইধরণের চ্যারিটি করা যায় , অ্যানিম্যালদের জন্যে নির্মিত সেইসব সাইট থেকে গোটা পশু ও অর্থ ডোনেট করে দান করা যায়। পশুকে কোনো চাষী কিংবা পশুপালক নিয়ে যাবেন। খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। আজকাল সবই হাতের মুঠোতে। শুধু একটি ক্লিকের দূরত্বে।

ওদের কেমিক্যাল কোম্পানি , শ্রমিকদের প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাবার জন্যে প্লেনের টিকিট দেয়। ঐ ক্ষুদ্র প্লেন চালনা করে তন্ত্র কর্পোরেশান। নেপালের যেকোনো প্রান্তে গিয়ে তারা উইকএন্ডে দেখা করে আসতে পারে। তাই অনেকেই দূরের গ্রাম থেকে কাজে আসে। সুন্দর ব্যবস্থা।

আবার একটি মেয়ে ভারত থেকে এসে নেপালে দেহব্যবসার কাজ করে মোটা অর্থ রোজগার করে ফিরে যেতো। শেষে ওদের এক কর্মীর সাথে ঘর বাঁধে। ওকে আবার ওদের ফ্যাক্টরিতে কাজ দেওয়া হয়। সোফির স্বামী বলেন : শোধরানোর সুযোগ দেওয়া।

মূলস্রোতে ফিরে আসার একটি সুযোগ দেওয়া। যোগীদের কাছে , প্রকৃত তান্ত্রিকদের কাছে সিনার বা পাপী বলে কোনো কনসেপ্ট নেই। সিন আমাদের ইমপার্ফেক্ট মাইন্ডে। ক্ষমার আলোয় ধুয়ে নিলে কৃষ্ণ গহ্বর পূর্ণ ভুবন সুন্দর হয়।

ওর স্বামী যোগ ধ্যান করে অবসরে আর নেপাল তো তন্ত্রেরই দেশ ! নে মুণীর দ্বারা রক্ষিত এই অপরূপ ভূমি নেপাল। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে এর কথা। বাগমতী নদীর তীরে উনি সাধনা করেন। হেমরাজও উচ্চস্তরের মানব সন্তান।

একটি অফিসের লোক একবার বাইরে বেড়াতে গিয়ে কোনো খেলা খেলে একটি অযাচিত উপহার পায়। চামড়ার ব্যাগ। আনার সময় ওকে বিমান বন্দরে ধরে। কাস্টমসে। কারণ ব্যাগের ভেতরে ওরা অনেক হার্ড ড্রাগস্ পুরে দেয় যা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিলো না। সে ফোন করে ওর স্বামীকে। ওর স্বামী তাকে বাঁচায়। ওরা কর্মীদের নিজেদের পরিবারের অংশ মনে করে। তাই তারাও প্রাণ ঢেলে দেয় কাজে। ওর স্বামী বলেন : ওদের নিজের ভাবলে ওরাও তোমায় আপন মনে করবেন। ওদের সুখে দু:খে পাশে দাঁড়াবে।

আসলে হেমরাজ পেখম লামা খুবই মায়াবী। স্নেহপ্রবণ। তাই তো উনি সোফিকেও আপন করে নিয়েছেন এত সহজে। অর্ফান। সামাজিক পরিচয় হীন। তবুও। হেমরাজের তো নেপালে নাম আছে। এলিট হিসেবে। অভিজাত মহলে ওঠাবসা আছে। এলিট নিজ গৃহে , ফুলদানিতে স্থান দিলেন এক ঘাসফুলকে।

সবই চন্ডী শুনেছেন সোফির মুখে। হেমরাজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে।

ওদের কোম্পানি নেপালের দূর্গম অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে দরিদ্র পাহাড়িদের জন্যে একটু উষ্ণতার সুব্যবস্থা করছে। সোলার হিটার ও এনার্জি।

বড্ড শীতলতা যে ! আর বিদ্যুৎ নেই সবখানে। হেমরাজের হৃদয় কাঁদে। ক্রন্দনে ক্রন্দনে ভারী দুই চোখের পাতা। নেপালিরা বড্ড মদ্যপ। বরফের কারণে। মাতাল মানুষের মনে একটু সুস্থতা আনতে বদ্ধপরিকর হেমরাজ পি লামা।

ওর রসায়ন কারখানায় যে লাভ হয় তার অনেকাংশই খরচ হয় এইসব ছাইপাশে।

আবার নানান পুরাতন মন্দির সংস্কারের ঝামেলা আছে। সেগুলো করেন।

ফারপিং-এ কিছুদিন আগেই একদল সন্ন্যাসীকে অন্নবস্ত্র দিলেন। আর প্রত্যেককে একটি করে লণ্ঠন। পাহাড়ি পথে ওদের লাগে। এসবই উনি করেন প্রাণের টানে।

হেমকুন্ডের হেমরাজ পি লামা। সত্যি এক লামা। ব্যবসাদার হয়েও। কে বলে ডেবিট ও ক্রেডিটের মধ্যে বাস করেনা অমৃত ? শুধুই সেখানে গরলের সাগর ? দানব ? মানব বা চৈতন্য নন ! হিরণ্যগর্ভ বিজনেসেও।

১৫।

চন্ডী মৈত্রের নিজের জীবনের কথা মনে হয় ফ্ল্যাশব্যাকে। ভাগ্য বলে কিছু নিশ্চয়ই আছে। নাহলে তার জীবনটাই তো একটি সৃষ্টিছাড়া উপাখ্যান। এমনটি কি হবার কথা ? বনেদী পরিবারের ছেলে। দারুলিয়ার রাঙামাটির ছেলে। বিরাট দালান , জমিজমা , লোকলস্কর, পুকুর , মাছ , এক একটি মাছের সাইজ কি ! ইয়া ইয়া , মানুষের চেয়ে কত্তো বড় !

সেই বাড়ির ছেলের জীবনের অর্ধেক কেটেছে রিক্‌শা টেনে !

পরে চাকরি যোগাড় করেন। এক দয়ালু মানুষের বাড়িতে থেকে পড়ার সুযোগ পান। তার ছেলে পাশ করতে পারেনা। উনি পাশ করে কাজে ঢুকে যান। চাঁদনী রাতে ধানক্ষেতের পাশে বসে বসে পড়তেন। ল্যাম্পপোস্টের নিচে লিখতেন পরেরদিনের পড়া। এইভাবেই কেটেছে দিন। অথচ ওরা ধনী। বনেদী। বাবার তিন বৌ। ওর মা প্রথমা স্ত্রী। ওর শৈশবে মারা যান। পরের দুই মায়ের মধ্যে দুই নম্বর মা ভালই ছিলেন। ওকে যত্নআত্তি করতেন কিন্তু উনিও বেশিদিন বাঁচেন নি। আঁতুর ঘরেই মারা যান। তার কন্যা ওর একমাত্র সহোদরা। তিন নম্বর মা ওকে জ্বালাতন করতেন। প্রকৃত সৎ মা। যার জন্যে ঘর ছাড়েন। ওর বোনই একমাত্র ওকে ভালোবাসতো ঐ বাড়িতে।

অনেক বছর পরে একবার ঐ বাড়িতে যান ওর বোনের বৈধব্যের সংবাদ পেয়ে। তখন উনি প্রায় ৪০। স্ত্রী কন্যা নিয়ে সংসার। তখন ওরা ভাবে যে উনি সম্পত্তির লোভে এসেছেন। ওদের কাপালিকের বংশ। ঠগীদের ঠাকুর কালীর আরাধনা করতো। মা কালীর মূর্তি ছিলো। লোলজিহ্বা। অনেক তান্ত্রিক ছিলো যারা তন্ত্রকে বিকৃত করতো। কাজেই বশীকরণ বিদ্যা , ভূত প্রেত পিশাচের সাহায্য নিয়ে বশ করতো নানা মন প্রাণ। মারতো বাণ। ওকেও বাণ মারা হয়। উনি পঙ্গু হয়ে যান। একটি দিক ওর অবশ হয়ে যায়। শরীর প্রায় রক্ত শুন্য হয়ে যায়। শেষে ওর স্ত্রীর চেষ্টায় ও ওদের লোকাল পুরোহিতের পরামর্শে মহারাষ্ট্রে শনি সিংহনাপুরে শনি পুজো ইত্যাদি দেওয়ার পরে উনি সুস্থ হন। শনি ওখানে খুব জাগ্রত। ঐ গ্রামে কারো গৃহে দরজা- জানালা নেই। চুরি হয়না। কেউ চুরি করলে রক্তবমি করে মারা যায়। গ্রাম থেকে পালাতে পারেনা। শিরডি যাবার পথে এই মন্দির। একটি কালো পাথরের শনি মূর্তি আছে। যা স্বয়ম্ভু। রাখালেরা এই পাথর পান বহু আগে।

রোকো ব্যাঙ্ক এখানে একটি লকলেস ব্রাঞ্চ খুলেছে ক্রাইম রেট প্রায় শুন্য দেখে যদিও তাই নিয়ে অনেকে অনেক মন্তব্য করেছেন। চন্ডী বাবুকে একজন অবশ্য বলেছেন যে এখানেও গত দু বছরে নাকি চুরি হয়েছে। তবে চোর হয়ত মারা গেছে সেই বিষয়ে উনি কিছু জানেন না।

তাই এখন উনি একটু পা টেনে হাঁটেন। ছোবলের চিহ্ন রয়ে গেছে। অস্তরাগের আলোতেও দেখা যায়। বাণ মারার চিহ্ন।

১৬।

সোফিয়া পেখম লামা চন্ডী বাবুকে বলছিলো যে ওদের ওখানে একটি দক্ষিণী মুসলিম মেয়ে আছে। সে একটি মুসলিম স্কুলে পড়ায়। ওটা আসলে মাদ্রাসা নয়। স্কুল। কোনো হায়দ্রাবাদী ব্যবসাদার শুরু করেছেন। ওখানে কেন তা সে জানে না তবে ওর সেখানে অনেকগুলি চেন বিরিয়ানির দোকান আছে যেখানে সুস্বাদু হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি পাওয়া যায়। সেই স্কুলে ও একবার সোফিকে নিয়ে যায়। ভাগ্যগণনার জন্যে। এই একটু সময় কাটানো , বাচ্চাদের। মজা আরকি। এক্সট্রা এক্টিভিটি। ওরা খুব মজা পায়। সোফি ওদের জীবনের নানা টুকিটাকি বলে। তাই। কেউ কেউ ওর কার্ড নিয়ে যায় ও পরে বাবা মায়ের সাথে আসে।

সেই মুসলিম মেয়েটি যার সাথে ও ঐ স্কুলে যায় তার নাম হালা। হালা হুসেন। হালা সুন্নি মুসলিম। খুবই ভালো মেয়ে। কোরানের পাঠ দিতো একটি জায়গায় সে। বিনা পয়সায়। ছেলেপুলে অনেক ওর।

ওর বাবা ওকে সেইসব শিখিয়েছিলেন। ওর বাবা আবার শঙ্করাচার্যের আশ্রমেও যেতেন। দক্ষিণে। সেই হালা তামিল মেয়ে কিন্তু থাকতো অন্ধ্রপ্রদেশে মানে হায়দ্রাবাদে।

তাই তামিল ছিলো ওর মাতৃভাষা। তামিল অক্ষরগুলি কেমন আমাদের অংকের জ্যামিতির পাই চিহ্নের মতন। বেশ দেখতে লাগে।

হালা তামিলে মাঝে মাঝে কথা বলতো। আর পেখম লামার বাচ্চা সব বুঝতে পারতো। সে তো জন্মসুত্রে নেপালি। কিন্তু সব কথা হুবুহু বুঝতো। আজব কান্ড। সে কোনোদিন ভারতেই যায়নি তো দক্ষিণ ভারত! আর তামিল শোনেও নি আগে। খুবই অদ্ভুত কান্ড। ওরা খুব অবাক হয়েছিলো। ওকে হালা স্কুলে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলো সবাইকে। গিনেস বুকে নাম দেবার কথাও হয় কিন্তু ওর বাবা বাধ সাধেন। এত ছোট মেয়ে! ওরা এসব পাবলিক করতে চান না। লামার বাড়িতে একটি তাগড়াই কুকুর আছে। সে নাকি হিলিং ডগ। হিলিং দেয়। কাছে এসে দাঁড়ায় ও আস্তে করে গায়ে পায়ে মাথা বুলায়। এই ওর হিলিং। রেইকির মতন। অসুস্থ মানুষ সেরে যায় সেই হিলিং পেয়ে। নেপাল সত্যি রহস্যময় দেশ। কুয়াশা মোড়া। সোফির বাচ্চার নাম তাই হালার স্কুলে সবাই দিয়েছে এখন টামি। কারণ সে তামিল বুঝতে পারে। না জেনেও। হালা ওর সাথে তামিলেই কথা বলে। মাতৃভাষা নাকি এতে মনে থাকবে!

হালা আর সোফি খুব বন্ধু। দুজনেই অবসরে গহীন অরণ্যে ট্রেকিং করতে যায়।

১৭।

সুভদ্রা মিত্র নাম্নী এক স্কুল টিচার শহরে এসেছিলেন গ্রাম থেকে। বীরভূমের লাল গ্রাম। ওখানে ধারাশঙ্করের ঠাঁই হয়েছিলো। কাঁসুলি বাঁকে উপকথা লিখেছিলেন ওখানে একটি নদী দেখে। নদীর বাঁক দেখে। ওখানকার উপজাতিদের কথা , জীবন। হতদরিদ্র মানুষ। ছেঁড়া জামা জুতো হীন পা। সেইসব দেখে বড় হয়েছেন সুভদ্রা। পরে এক কলকাতার প্রফেসর এসে ওখানে ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস যোধালি সম্প্রদায়দের নিয়ে কাজ করেছেন। উনি ওদেরকে বোঝান যে চুরি চামারির বাইরেও একটি ভুবন আছে এবং তা সুন্দর। মূলস্রোতে ওদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ভদ্রলোক খুব ব্রিলিয়্যান্ট স্কলার ছিলেন। বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র। যাঁর আইনস্টাইনের সাথে পেপার আছে। সেই ভদ্রলোক এই সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করেন। সুভদ্রা খুব শ্রদ্ধা করতেন ওঁকে। তাই ছেলেকে একটি আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। মানুষের জন্যে কাজ করবে। সৎ চিন্তা ও সৎ কর্ম এই দুটিই জীবনের চলার পথের পাথেয়। অসৎ কাজ কদাচ যেন না হয়। হলে অনুতাপ করবে , ক্ষমা পাবে। মহাপুরুষেরা সবাই বলে গেছেন : সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপন করো বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। তৎক্ষণাৎ নাহলেও পরে।

সেই ছেলে শহরে এসে হারিয়ে গেলো। এক শহরে বড়লোকের মেয়ে যে কিনা ওর সহপাঠি তার প্রেমাগুনে পুড়লো। ছেলেটি আই আই টিতে চান্স পায়। মেয়েটি ওর নোট মুখস্থ করে পাশ করে। পরে ওকে বিয়ে করে জোর করে। মা কে জানাবার সুযোগও

দেয়না। কিন্তু সে ওকে কিছুদিন পরে ছেড়ে দেয়। অন্য এক প্রফেসরের সাথে বিদেশে পাড়ি দেয়। তার বাড়িঘর বড়। বাবা ডিপ্লোম্যাট মা ডাক্তার। এই গ্রামীণ ছেলেটি ডুবে যায় ডিপ্রেশানে। মায়ের সাথে আর যোগাযোগ করেনা। চিঠি দিয়ে উত্তর না পেয়ে ও ফোনে ধরতে না পেরে উনি একদিন হাজির হন ওর মেসে। ছেলেকে পান না। কেউ বলে নদীতে ডুবে মারা গেছে , কেউ বলে বাসে করে কোথাও চলে গেছে। কেউ কোনো হদিস দিতে অক্ষম। ভদ্রমহিলা গ্রামে একটি স্কুলে পড়াতেন আর ওদের জমিদার বাড়ির প্রেসে কাজ করতেন। তাই পুরাতন প্রফেসর ও সমাজসেবক ভদ্রলোকের ঠিকনা নিয়ে ওঁর সাথে দেখা করেন , যাঁকে উনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সুভদ্রা দেবীকে একটি স্কুলে কাজ দেন। টিচারের কাজ তো নয়। আয়া ধরণের। সেই স্কুলে পড়তো মৈথিলী ও যোগিনী। ধনীদের স্কুল। মেয়েদের স্কুল। আয়ার মতন মনে হতনা সুভদ্রা আন্টিকে। নেপালি আন্টি ছিলো কিছু। বেঙ্গলি এই একজনই। খুব আস্তে কথা বলতেন। স্নেহশীলা। ভদ্র। রাতে নাকি কাছে স্বপ্নসুন্দরী নামক সিনেমা হলে টিকিট দেখাতেন। একা থাকতেন। একটি মেয়েদের পল্লীতে। অল্প জিনিস দিয়ে রুচিপূর্ণ খাবার বানিয়ে দিতেন। শালীন। শোভন। মার্জিত।

মৈথিলীর কেন জানিনা ওকে খুব ভালো লাগতো। পরে বড় হয়ে একবার স্কুলে দেখা করতে যায়। শোনে ঐ আন্টি অবসর নিয়েছেন। আসলে ওকেই দেখতে যায়।

সুভদ্রা নাকি পল্লী ছেড়ে দিয়েছেন। এখন একটি ধূসর পাহাড়ের গায়ে থাকেন। ওখানে এক লেখক সমাজসেবা করেন। গরীব দু:স্থদের স্কুল চালান। সেখানে সুভদ্রা আন্টি পড়ান। উনি নাকি আগে গ্রামের স্কুলে পড়াতেন। কবিতার বইও বার করেছেন। নাম প্রস্ফুটিত।

মৈথিলীকে একবার এক ফেমাস পোয়েট একটি পার্টিতে বলেছিলেন : এখন আগাছারাও সাহিত্য করছে।

কিন্তু সুভদ্রা আন্টি অনামী হলেও কবিতাগুলি এত সুন্দর , সুগ্রন্থিত । উনি আনসাং হিরো । শোনা গেলো উনি কারো সাথে দেখা করেন না । কেউ গেলে বিরক্ত হন । স্কুলের অনেক পুরাতন সহকর্মী ওঁর হঠাৎ বিকশিত হওয়া প্রতিভার কারণে দেখা করতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েন । উনি মুখ ঝামটা দিয়ে দেন ।

- তোমাদের শিক্ষিত সমাজের আমার কাছে আসার দরকার নেই বাপু । আমি মনের খোরাক যোগাতে লিখি । লেখা আমার নেশা , পড়ানো পেশা ।

১৮।

কলকাতার বিখ্যাত পত্রিকা কংসকূল এর সামনে বিরাট জটলা । অনেক লেখক ও লেখিকাকে ব্লুটালি মারা হয়েছে । মেরেছেন এক নব লেখিকা মীরা রঙ্গনমূর্তি । মীরার বাবা দক্ষিণী , মা বাঙালি । মেয়েটি গিফটেড্ লেখক ও কবি । নব ধারার গল্প লিখেছে । দলবাজি করেনা । একটি পত্রিকা চালাতো যেটা বেশ নামী ছিলো । অনেক নতুন , আনকোরা লেখককে সুযোগ দিয়েছিলো ওর পত্রিকা । ও দেখতে পায় যে দলবাজি ও ধান্দাবাজি করে করে অযোগ্য লেখক ও লেখিকা উঠে যাচ্ছে , বড় বড় পত্রিকায় সুযোগ পাচ্ছে ও মিনি নাম করে ফেলছে । ওকে হেয় করছে , তির্যক মন্তব্য করছে , নাকোচিত লেখিকা বলে বিদ্রুপ করছে তারাই যারা একদিন ওর হাত ধরে লেখালেখি জগতে উঠেছে এবং যোগ্যতার বিচারে বেশ নিচের দিকে ।

তারা লেখায় ওসামা বিন লাদেনকে কর্মযোগী বলে প্রচার করে এবং বলে যে কোনো দরবেশ নাকি এই টেররিস্টকে প্রটেকশান দিচ্ছেন তাই ওকে কেউ ধরতে অক্ষম । বিবেকানন্দ ছিলেন কর্মযোগী , পরমহংস যোগানন্দ , স্বামী শিবানন্দ । কর্মযোগা ইজ নট কর্মকান্ডা - বলেছেন স্বামী অগ্নিবেশ । এছাড়া একজন উগ্রপন্থী যার সৃষ্ট দল পুরো বিশ্বের মানচিত্র বদলে দিচ্ছে সে কর্মযোগী ও তাকে রক্ষা করছেন কোনো দরবেশ এইসব ছাইভস্ম লেখায় যারা প্রচার করে তাদের লেখা বার হয় প্রিমিয়াম ম্যাগাজিনের পাতায় অথচ ওর লেখা ছাপা হয়না ।

কিছু খ্যাতনামা লেখিকা ও লেখক নিজ স্বার্থসিদ্ধির কারণে এদেরকেই সুযোগ দিচ্ছেন এবং অন্য প্রতিভাবান ও প্রতিভাময়ী স্রষ্টাদের বঞ্চিত করছেন , অপমান করছেন । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এরা এন আর আই । বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশান চালায় অথবা এদের পতিরা কোনো বড় সংস্থার চেয়ারম্যান ।

মীরা পুলিশকে বলেছে যে সে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে। ও সাধারণ মানুষ নয়। বিখ্যাত বা কুখ্যাত হবার জন্যেই ওর জন্ম । সমাজ ওকে মালা না পরালে ওর দেহকে ফাঁসি দেবে । তাতে ওর নাম উঠবে খবরের কাগজে । এতে কিছু সমাজের জঞ্জাল ও সাফ করে যেতে পেরেছে । তরুণ কবি ও লেখক লেখিকা যারা প্রতিভা ধরেন তারা অন্তত এবার সুযোগ পাবেন । অন্যরা ভয়ে সহজে আর অন্যায় করবে না । যেইসব লেখককে ও মেরেছে সবই অত্যন্ত নৃশংস হত্যাকান্ড । গুহ্যে বন্দুক ঢুকিয়ে গুট করা হয়েছে কিংবা মাথায় অজস্র গুলিবর্ষণ । যেন ওর সমস্ত রাগ ও ঢেলে দিয়েছে এদের ওপরে । চাবুকের মতন এক এক করে গুলি এসে পড়েছে এই সমস্ত মদের গ্লাস হাতে নেওয়া নামজাদা স্রষ্টাদের ওপরে যারা ভাগ্যের প্রভাবে খবরের কাগজের অফিসে বসে একের পর এক অন্যায়কে প্রশয় দিয়ে চলেছেন । লোকসমক্ষে এরা তরুণ কবিদের প্রতিনমস্কার করেন অথচ আড়ালে বিশ্রী ভাবে গালি দিয়ে বিতাড়িত করেন পত্রিকা অফিস থেকে ।

নেপোটিজম , দলাদলি , প্রতিভার স্ফুরণ না ঘটতে দেওয়া , সাহিত্যের অবমাননা --- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধানের ফোন : আমার অমুককে সুযোগ না দিলে তোমার ছেলের চাকরি হবেনা বা পেনশান বন্ধ হয়ে যাবে । কাজেই সুযোগ পায় : কাঁচা স্রষ্টা ।

চায়ের কাপে জল দিয়ে রাখুন , ঘরে বসে হাতপাখায় হাওয়া দিন এইসব লিখছে যারা তাদেরকে তুলছে যেইসব নামী স্রষ্টা তার নিপাত যাও ।

স্ম্যাশ দেয়ার হেডস্ -- এটা স্লোগানের যুগ । টুইটারে এই স্লোগান দিয়েছে সে ।

নামী বাচিক শিল্পী বসে এদেরই নিম্নমানের গল্প পাঠ করছেন জনপ্রিয় কেবেল কিংবা এফ এম্নে ।

প্রতিভাকে সুযোগ দাও। নাহলে চাবুকের বাড়ি খাও। ওর সোজা হিসেব।

মীরা রঙ্গনমুর্তি যেন ভয়াল এক মূর্তি। যার হাতে খড়্গ , তীর ধনুক , ক্যালাশনিকভ - এ কে ৪৭ যাই বলো।

সমাজের অবক্ষয় যা শুরু হয়েছে শতাব্দী ধরে তাকে ছিন্নভিন্ন করতে এগিয়ে এসেছে মীরা নাম্নী এই রণমূর্তি। অস্ত্র নিয়েছে তুলে নিজ হাতে।

মীরা রঙ্গন মূর্তি নন , রণমুর্তি। এই ঘটনার জন্যে তার কোনো অনুশোচনা নেই। সে বলে : এ হল অনেস্টির পাওয়ার।

পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড নয় আজকাল সোর্ড ইজ মাইটিয়ার দ্যান পেন।

ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী ওর প্রিয় চরিত্র।

মীরা রঙ্গনমূর্তি স্রষ্টা মীরার সৃষ্ট এক বিদ্রোহী চরিত্র। স্রষ্টা নিজেই নিজেকে ভাঙে ও গড়ে। বলেছে :

রাহু কেতু শনি নরসিংহ অবতার ও ধূমাবতী মা আমার প্রিয় ঠাকুর। কারণ ওঁনারা অসৎকে চরম দন্ডে দন্ডিত করেন। ক্ষমাহীন ভাবে। আর নাস্তিকরাও আমার প্রিয়। যারা সৎ। কারণ তাদের অনেস্টির পাওয়ার থাকে। তারা অসৎ ভাবে অন্যায়কে প্রশয় দেননা।

১৯।

মীরা খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দিয়েছে । ওখানে সে এও বলেছে যে আজকাল কিছু নারীবাদী লেখিকা হিন্দু দেবদেবী ও মাইথোলজিক্যাল চরিত্রদের নিয়ে মস্করা শুরু করেছে যা ঠিক নয় । কতগুলি মূর্তি ও চরিত্র তো জাতপাত ও বিভেদের জন্য দায়ী নয় । দায়ী সমাজের পুরুৎ শ্রেণী , বলশালী লোক , অর্থবান মানুষ , ইগোর প্রকোপে পড়া মানুষ । কাজেই রাগটা তাদের ওপরে দেখানো উচিৎ । নিরীহ মূর্তি কি করবে ? মাইথোলজিক্যাল চরিত্রই বা কি ??

সীতার অশোকবনে বসে যৌনক্ষুধা কিংবা দ্রৌপদীর বহুগামী স্বভাব , কুন্তির পার্ভার্শান ছিলো তাই বহু পুরুষকে কামনা , এগুলি না লিখে এইসব তথ্যের আড়ালে যে সুক্ষ্ম দর্শন রয়েছে তা খতিয়ে দেখা উচিৎ প্রতিটি হিন্দুর । ওগুলির স্থুল বিচার না করে । আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে এত হাই ফিলোসফি রয়েছে অথচ আমরা ওয়েস্টকে কপি করতে সদাব্যস্ত । কিছু স্যুডো ইন্টেলেকচুয়াল এগুলোতে ইন্ধন যোগান । ওরা মানুষী নন । উচ্চস্তরের আত্মা। ওদের কুলকুন্ডলিনী অতীব জাগ্রত । ওরা আমাদের মতন সাধারণ মানবী নন যাদের সেক্স লাইফ খুব অ্যাক্টিভ । দিবারাত্রি যোনি আর অন্ডকোষের মিলন নাহলে ষোলকলা পূর্ণ হয়না । যেকোনো জিনিস নিয়ে লেখার আগে সেই বিষয়ে রিসার্চ করে নেওয়া উচিৎ । বেদজ্ঞ পন্ডিতরা রয়েছেন কীসের জন্যে ? সীতাকে মানুষে পরিণত না করে নিজেকে

দেবীত্বে উন্নীত করা যেতে পারে তাতে উভয়েরই মঙ্গল এই লাগামছাড়া যৌনতার যুগে। কাম আর কাম এই তো চারদিকে। আরো কাম ? একটু নিষ্কাম হোক সব !

কিছুদিন যাক না শীতঘুমে এত কাম ! শরীর শরীর শরীর , তোমার মন নেই কুসুম ?? সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে ? বেদজ্ঞ পন্ডিতের সাথে , কিংবা ইসলাম নিয়ে লেখার আগে ইসলামিক স্কলারদের সাথে আলোচনা করা উচিৎ। এতে ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতি কমে যাবে। সমাজে ঝামেলা কমবে। মারদাঙ্গা কমবে অহেতুক। এত রক্ত ক্ষয় ও লোকক্ষয়ের কী বা প্রয়োজন? মানুষে মানুষে মিতালি হোক।

তবে প্রয়োজনে আসুক বিপ্লব। আসুক ঝড়। যেমন সে এনেছে।

ফেমিনিজম মানে উচ্ছৃংখলতা নয়। দিবারাত্রি বসে মদ্যপান ও বিকিনি পরে সেক্স করাও নয় ,ফেমিনিজম মানে স্বাধীন চিন্তা করা। মেয়েরাও মানুষ সেই ভাবনা তাদের মনে জাগিয়ে তোলা। তারপরেও সে যদি গৃহবন্দী হয়ে থাকে মন্দ কি ? সে যদি স্বামী সেবা করে , ভালো খানা খেয়ে সুখী হয় তাতে দোষের কি আছে ? ঘ্রাণেই তো অর্ধ ভোজন হয়!

কোনো ভোজন রসিক মেয়ে যদি জীবনটা রেঁধে বেড়ে কাটান তাতে কোন ফেমিনিস্টের কী বা বলার আছে আর হল ফোটানোর আছে ? সে তো এক অ্যাডমিরালের স্ত্রী কে জানে যিনি সারাটি জীবন শুধু রান্না করে কাটালেন। এবং অত্যন্ত সুস্বাদু সেইসব রান্না যা নিয়ে তাঁর নাতনি এখন বই বার করেছেন এবং বেস্ট সেলার। উনি কোনো অংশে কম যান ?

ওঁর বা ওঁর পরিবারের কারো তো এইজন্যে কোনো ক্ষোভ নেই যে উনি কোনোদিন পুরুষের ছত্রছায়া ছাড়েননি !

এসবই মীরা রঙ্গনমুর্তির নিজস্ব বক্তব্য। লেখকদের তো নিজেদের তত্ত্ব থাকেই। তাই তো তাঁরা লেখক। তাঁরা আমাদের পথ দেখান। যখন গভীর বনে আমরা পথ হারিয়ে ফেলি। কনফিউশান আমাদের ঘিরে ফেলে জীবনের পারাবারে।

মীরার জীবনটা আসলে অন্যধরণের। ওর বাবা ছিলেন পাইলট , দক্ষিণী। নর্থ বেঙ্গলে হেলিকপ্টারের পাইলট ছিলেন। পরে মাদ্রাজে হাসপাতালের হয়ে কাজ করতেন। এমার্জেন্সিতে বড়লোক রুগীদের ওদের বাসা থেকে নিয়ে আসতে গেলে ছোট ছোট হেলিকপ্টার যেতো। ওর বাবা চালনা করে নিয়ে যেতেন। আগে হেলিকপ্টার চালনা করার সময় অনেকদিন ওরা উত্তরবঙ্গে ছিলো। তখন ওর মা কে ওর বাবা বিবাহ করেন। আগের স্ত্রী ছিলেন কেরালাইট। নি:সন্তান। মৃতা। ওর মা ছিলেন সেই স্ত্রীর নার্স। দেখাশোনা করতেন শেষ সময়ে। পরে ওর বাবা ওকেই বিয়ে করেন। আগের স্ত্রী কোনো জটিল ব্যাধিতে ভুগে মারা যান। মরার আগে নার্সের হাতে খেয়ালি স্বামীকে সঁপে দিয়ে যান। মীরার মা চা বাগানের ম্যানেজারের মেয়ে। পরে নার্স হন। বাবা অবসর নিয়ে দক্ষিণে চলে যান। মীরাকে মা বাংলা স্কুলে পড়ান। ও লিখতে পারতো ছোট থেকেই। ভালো লিখতো। পরে লেখিকা ও কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বই -টই বার করে। ১৭ টি বই লিখেছিলো যা প্রশংসিত। তবুও কেউ ওকে চান্স দেয়নি। আনকোরা লেখক লেখিকা চান্স পেতো। ওর বাবার জীবনটিও খুব দু:খময়। উনি অবৈধ সন্তান। বিয়ের আগে জন্মান। সেইসময় কৈশোরে ওর ঠাকুর্দা ও ঠাকুমার ভালোবাসার সন্তান এই মানুষটিকে ওর ঠাকুমা অ্যাবর্ট করাতে চান। ওর ঠাকুর্দা বেঁকে বসেন। বলেন : তুমি যদি ওর জন্ম না দাও আমি খবরের কাগজে জানাবো। লোক জানাজানি করবো। ওকে মেরে ফেলো না।

ভদ্রমহিলা ঘাবড়ে যান। তখন ওরা বিয়ে করেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে। এবং ওর বাবা জন্ম নেন।

অনেক কষ্ট সহ্য করে ওরা বাচ্চা মানুষ করেন। দুজনেই কাজ করতেন। সেইসময় মেয়েদের কাজ করা সমাজে ভালো চোখে দেখা হতনা। নানান ধরণের কুরুচিকর মন্তব্য ওকে শুনতে হত। তবুও উনি মীরার বাবাকে মানুষ করেন। কিন্তু অপছন্দ করতেন মনে মনে কারণ তার জন্যেই তো এই ভোগান্তি তাদের। বাচ্চাকে মেরে ফেললে আজ এই দূর্দশা হতনা। ওর দাদুকেও এইজন্যে ঠাকুমা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেন নি।

২০।

মধ্যজীবনে ওদের আরো বেশ কয়েকটি সন্তান হয় । তাদের সবাই যথেষ্ট স্নেহ ভালোবাসা পেতেন । মীরার বাবা ব্যাতীত । ওকে চিরটাকাল ওর ঠাকুমা হেয় করতেন । শেষ সময় ওর দাদুকে একা ফেলে রাখেন । অযত্নে ও অবহেলায় উনি মারা যান । কাউকে কাছে যেতে দিতেন না এই মহিলা । প্রতিশোধ তুলছেন কৈশোর প্রেমের একটি ছোট্ট ভুলের ।

মাশুল দিচ্ছেন ভদ্রলোক , বৃদ্ধ বয়সে , অক্ষম অবস্থায় শুধু একদিন একটি পুণ্য করেছিলেন বলে । একটি নিষ্পাপ শিশুকে বাঁচিয়েছিলেন তাই । মীরা ভাবে : এই কি ধরণের বিচার বিধাতার ?

শেষসময়ে ওর ঠাম্মা যখন হাসপাতালে তখন ওর বাবা দেখা করতে গেলে ঠাকুমা দেখা করেন না। অনেক কাকুতি মিনতি করার পরে ঢুকতে দেন।

বেডের পাশে উনি দাঁড়িয়ে , ঠায় । মহিলা চোখ পিটপিট করতেই থাকেন । উনি দাঁড়িয়েই আছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা। শেষে মহিলা বলে ওঠেন : তোমার অশেষ ধৈর্য্য দেখি ! তোমাকে বিদায় করা বাপু সোজা নয় ! বলো কি খবর।

এর পরের পরের দিনই উনি মারা যান। এই হল মীরার বাবার করুণ কাহিনী।

অপমান ,লাঞ্ছনা , অবমাননা নিয়েই বড় হয়েছিলেন উনি তাই কিছুটা নিঃস্পৃহ হয়ে যান নিজের প্রতি। সেই স্বামীকেই ওর নার্স মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে যান ওর পূর্ব পত্নী।

পাইলট হন শখে নন। এই ভেবে যে যদি এই ভয়ানক পেশায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট এর মুখে পড়েন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ঢুকে পড়লেন এই পেশায়। ফিটনেস টেস্ট , রিফ্লেক্স টেস্ট সবকিছুতেই পাশ করেও গেলেন। হাইট খুব ভালো। চোখের পাওয়ারও। কাজেই অসুবিধা হলনা। হলেন বায়ু যানবাহনের চালক। কিন্তু বাঁচলেন অনেক দিন। স্বল্পায়ু হননি। আশাহত হলেন উনি। ভাগ্যের খেলা একেই বলে। রাখে হরি মারে কে ! মারে হরি রাখে কে।

সবার কর্ম্মের বোঝা তাকেই বইতে হবে , তবেই ছুটি। অথচ ওরই এক দামাল পাঞ্জাবী পাইলট বন্ধু একদিন সকালে রুটিন ফ্লাইটে গেলেন আর ফিরলেন না। এয়ার ক্র্যাশে নিহত হন। যাবার আগে ওঁকে বলে গিয়েছিলেন: রোজ পারলে হনুমান চালিশা পড়বে। সব বাধা কেটে যাবে। আমি রোজ পড়ি। তাই তো বিমান চালাই। সহজে মরছি না ! বলে একগাল হেসে ল্যাডারে উঠে যান।

বন্ধুর প্রতি ভালোবাসায় ওর বাবা নিয়ম করে পড়তেন , ভক্তিতে তত নয়।

২১।

-প্রকৃত নাস্তিকেরা অনেস্ট হয় । তারা ধার্মিক মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি করে না , দেবদেবীদের নিয়ে কুৎসা রটায় না । ওরা নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে বাঁচে । ভালো কাজ করে যায় । সৎ চিন্তা । সৎ কাজ । এই তো আর কি ?

বলেছিলেন চন্ডী মৈত্রের এক কলিগ শশাঙ্কশেখর বসু । উনি সিনিয়র ইঞ্জিনীয়র ছিলেন । শখের কবি । টাটা কোম্পানিতে কাজ করতেন , জামশেদপুরে । লালমাটির দেশ । সাঁওতাল পল্লীর দেশ । ধামসা মাদলের দেশ , আনন্দের দেশ -- হাড়িয়া খেয়ে মজা হবেক লেশা হবেক লাই !

আরো বলেছিলেন যে : কোনো কিছু নিয়েই ব্যঙ্গ করা অনুচিত । যেমন কমিউনিজম কিংবা কর্পোরেট ট্রেন্ড বা যোগ ব্যায়াম ও জিম কালচার । সব কিছুরই প্রয়োজনীয়তা থাকে । ইউনিভার্স সবকিছুই লক্ষ্য করে । যখন যেটার দরকার ফুরিয়ে যায় সেটা চলে যায় । কালের নিয়ম আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা । সুতরাং অনর্থক একটি কমোশান

ক্রিয়েট করে কোনো লাভ নেই । সবাইকেই তার যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে । তবেই বিশ্বশান্তির বাণী প্রস্ফুটিত হবে ।

গান আছে না ? খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে , নীরব শিশু , আনমনে ---

শিশুকে মর্যাদা দিতে হবে । এই শিশু একধারে সরল আবার অন্যদিকে প্রচন্ড ম্যাচিওর্ড । যখন সময় হবে আপনিই তুলে নেবেন বিশ্ব সংসার থেকে অনর্থক , অচল বস্তু । শুধু ধৈর্য্য রাখো ।

কথাটার মূল্য সেদিন বোঝেন নি । আজ বোঝেন । মানুষের এইরকমই হয় বোধহয় । দামী জিনিস হাতের বাইরে চলে গেলে মূল্য বোঝা যায় । গেঁয়ো যোগী ভিখ পায়না । আবার সেই যোগী বিদেশে লেকচার দিয়ে এলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায় । তখন তার একটুকু ছোঁয়ার জন্যেও লোকে নিশাচর হতে পারে ।

ভগবৎ বিশ্বাসী নাহয়েও সুস্থ জীবন কাটানো যায় ; তা ধর্মের ধ্বজাধারীদের বোঝা উচিৎ। মারমার কাটকাট করা বন্ধ করা উচিৎ । ইসলাম দেশগুলিতে এখন অনলাইন কনডোম শপ খুলছে । টার্কিতে অবশ্য এগুলিকে বলে লাভ শপ । সেক্স , লাইফের নর্মাল পার্ট, ধর্মের সাথে তার বিরোধ কোথায়? নাস্তিকের সাথেই বা ধার্মিকের বিরোধ করার কি আছে ?সবাই মানুষ !

এসবই ঐ বন্ধুর কথা । পুরাতন বন্ধু , পুরাতন ভৃত্যের মতন ।

যত পায় বেত না পায় বেতন ! বড্ড কথা কয় , একনাগাড়ে ।

২২।

মীরা যখন উত্তরবঙ্গে ছিলো ওদের বাড়ির কাছে একটি মুসলিম ছেলে থাকতো যাকে সে ভালোবেসেছিলো । ছেলেটি এসেছিলো কোনো আরব দেশ থেকে । ওখানে সে একটি সংস্থায় গবেষণা করতো হিমালয়ের কিছু শিকড় বাকর নিয়ে । পরে ওর ভাইকে ওখানে নিয়ে আসে । মীরা ওকে ভালোবাসে । ওর ফার্স্ট ক্লেইম । কিশোরী মীরার প্রথম প্রেম । মীরা ওকে চিঠি লিখতো । ছেলেটিও মীরাকে চিঠি লিখতো । ইংলিশে । মীরা ওকে অলক বলে ডাকতো । কারণ ও মুসলিম । ধরা পড়লে যাতে কোনো কন্ট্রোভার্সি তৈরি নাহয় । সালটা ১৯৮৬-৮৭ । রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজ । অলক কিন্তু মীরাকে প্রেমানলে পুড়িয়ে চলে যায় নিজ দেশে , বলে ওখানে গিয়ে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে না ।

মীরা ওর সন্তান বহন করে । পরে অ্যাবর্ট করে দেয় । তিনটি পিল খায় । এক একটির দাম ৫৭ টাকা । আজও মনে আছে । কমলালেবু বাগানে , চা বাগিচায় ওরা প্রেম করতো ।

করালী নদীতটে । ডুয়ার্সের সীমারেখায় । কদম গাছের নিচে । ইউক্যালিপ্টাসের মায়াবী ছায়ায় । ভারি সুন্দর ছিলো সেইসব দিন । ইমোশান্স । কিশোর প্রেম । প্রথম ভালোবাসা , বুকের ভেতর কেমন করা । মন উচাটন । স্কুল পালিয়ে কালিম্পং , দার্জিলিং , ভুটান । রায়প্রধাণ পরিবারের মেয়েদের সাথে ভোরের শিশির কুড়িয়ে ফেরা । অলককে দেখা । রায়প্রধানদের মেয়ে মিষ্টুনিকে অলক সাজিয়ে ওকে চিঠি লিখতো মীরা । কারণ অলক

তো বাংলা পড়তে পারেনা। কাজেই বাংলার খেদ মেটাতো মিষ্টুনিকে লিখে। আসল চিঠি লেখা হত ইংলিশে।

সেই অলক ওকে ফেলে চলে গেলো। খুব দু:খ হয়েছিলো ওর। খুব কেঁদেছিলো। ওর বাবা ওর বড় বন্ধু। ওকে খুব হেল্প করেন সেই সময়।

অলকের ভাই একটি বৌদ্ধ্য মেয়েকে ভালোবাসে। সে থাকে বাংলাদেশে। পত্রবন্ধু। একটি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আলাপ। নাম অসীমা বড়ুয়া। খুব রক্ষণশীল পরিবার। বাবা জাজ ওখানে কোনো কোর্টে। ওর পরিবার খুব বর্ধিষ্ণু। খুব পাওয়ারফুল , তাই ঐ প্রেমও ফেল। ছেলেটি ওকেও পায়না। দেশে চলে যায়।

২৩।

এই অলক বলেছিলো যে ওদের যদি বিয়ে হয় তাহলে সাপুড়েদের বাঁশরির মতন এক বাঁশি বাজিয়ে ওরা বিয়ে করতে যাবে। ওদের দেশে এরকমই হয়। কালো মোটা বাঁশি। কালো আলখাল্লা পরে , মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি বেঁধে ওরা দলবেঁধে এই বাঁশি বাজিয়ে যায় বিয়েতে। সাথে ঢাক ও ঢোল। সে এক এলাহি কান্ড। তখন তো মোবাইল ক্যাম বা ওয়েবক্যাম ছিলো না কাজেই ও দেখাতে পারেনি কী ধরণের হয় এই বিয়ে। তবে থাকলে দেখা যেতো এখনকার মতন সব কিছু। বা ইউ টিউবে আপলোড করা থাকতো সবকিছু। তবে অলক ওকে নেচে দেখিয়েছে। কালো কাপড় বেঁধে মাথায়। ও তখন হেসে গায়ে ঢলে পড়ে বলেছে : এই যাহ্ ! কি হচ্ছে !

অলক বলে: তোমার ভালো লাগছে কিনা বলো ! মীরা হেসেছিলো।

- হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। খুব ভালো লাগছে।

- তাই তো দেখাচ্ছি। অলক ও খুব হাসছে !

এসব মনে পড়লে মীরার দু চোখের পাতা ভিজে আসে। ভারী হয়ে যায়। জীবনে কিছুই মনের মতন হয়নি তার। আর লেখাও ছাপা হয়নি কোথায়। অথচ সে কারো কোনো ক্ষতি করেনি। আজ সে প্রিজনে। হাতে তুলে নিয়েছিলো অস্ত্র। তা পেলে কোথায় ?

পেয়েছে অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে। ওরা রঙের কারখানা চালায়। আড়ালে অস্ত্রের ব্যবসা করে। অস্ত্র আসে সমুদ্র করে , জাহাজে ভেসে। ভিনদেশ থেকে। মীরা আন্তর্জালের মাধ্যমে জোগাড় করে। ঐ মৌচাক ভাঙার জন্য। লেখককূলের নষ্টামির মৌচাক।

প্রিজনে সে পড়ায়। রান্না করে। সময়টা ভালো কাটে। সব কয়েদী মন্দ নয়। অনেকেই বেশ স্বচ্ছ। জেলের প্রিস্ট একজন গে। উনি নিজের সাথীকে নিয়ে থাকেন। তিনি আবার পেশায় হাসপাতালের এক পশু চিকিৎসক। ওরা নাকি ওদের বাড়িতে এক অসহায় , পঙ্গু পশুদের সংগ্রহশালা চালায়। যারা ওদের ফেলে দেয় ওরা তাদেরকে এনে রাখে। বেশ অন্যরকম মানুষ।

মীরা যদি এদের কথা লেখার সুযোগ পেতো !

২৪।

মীরার টুইট পেজ আছে। ওকে আর অনলাইন হতে দেয় না জেল কতৃপক্ষ। কিন্তু ও অফলাইন লেখে। এই আশায় যদি কোনোদিন ওরা সেগুলি প্রকাশ করে। সেখানে ও জেলের নানা ঘটনা লিখেছে। তাতে এই দুই মানুষের কথাও লিখে রেখেছে।

একটি সারমেয় এখানে মালিককে হৃদরোগ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। গন্ধ শুঁকে। ফোনের ডায়াল টিপে। বেশ ভালো ঘটনা। লিখেছে। ছোট ছোট জিনিস লিখে রাখে।

ও যা করেছে তার জন্যে ও অনুতপ্ত নয়। বেশ করেছে। আরো আগেই করা উচিৎ ছিলো কারো। পরবর্তীকালের লেখক ও কবিকুল এতে স্বস্তি পাবে। লেখা স্বচ্ছন্দে ছাপাতে সক্ষম হবে। ও কোনো টেররিস্ট গ্রুপে নেই। অনেকেই সন্দেহ করছে। কিন্তু না। ও একাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও সেইমত কাজ করেছে। ও অনেক সিনিয়র লেখক, যাঁরা অবিচারের শিকার তাঁদের বলতো যে তাঁরা যেমন মাথা নিচু করে সব মেনে নেন ও তা পারবে না।
ওঁরা বলতেন : ওঁদের আছে শাশ্বত অক্ষর।
মীরা হেসে বলতো : অক্ষর লোকসমক্ষে যেতে অক্ষম , তাই তো এই ব্যবস্থা !
ওঁরা নিশ্চুপ। আসলে মানুষ ভীতু হয়ে গেছেন। মেরুদন্ড ভেঙে গেছে ওঁদের।

অন্যায় দেখেও কেউ প্রতিবাদ করেন না। তাই তো এত অরাজকতা। যে করেন তাকে মেরে ফেলে পাওয়ারফুল লোকেরা। তাই ভয়। মীরা উইল ওভারকাম টুডে। নট সামডে।

লেখকেরা ওয়ার্ডস্মিথ। শব্দে বাঁচেন। শব্দ নিয়ে খেলেন। শব্দই তাঁদের জীবন। তাঁরা কখন তুলে নেন আগ্নেয়াস্ত্র ? সমাজ ভেবে দেখেছে ?

মীরার প্রশ্ন ওর অফলাইন পেজে ! পাঠককুলকে। সে খুবই জনপ্রিয়। সবাই ওকে ছুঁতে চায়। তবে সবই অনুপত্রিকা মহলে। বড় পত্রিকায় লিখলো কৈ ?

চুনোপুঁটিরা এফ এমে সাক্ষাৎকার দেয়। পি পি জি কেবেলে তাদের কাঁচাগল্প পড়ে যায় কোনো বাচিক শিল্পী। গল্পে কী প্রচার করে : চায়ের কাপে জল দিয়ে রাখবেন অথবা খেয়ে উঠে কুলকুচি করতে ভুলবেন না। সাহেবদের মুখে খুব দূর্গন্ধ ,পাহাড়িদের গায়ে যা গন্ধ --- একটি জাতের সম্পর্কে এই তাদের অবজার্ভেশান , পরিশীলিত ভাষণ লোকমাধ্যমে। এরাই আজ লেখক ও কবি। স্বামীর পদমর্যাদা ও পয়সার জোরে ইতালীয় , ফ্রেঞ্চ ভাষায় গল্প অনুবাদ। মীরার শক্তিশালী কলমের কথা কে জানে ? অস্ত্র তুলবে না মীরা ?? ছিন্নভিন্ন করবে না করোটি ?

২৫।

মীরা ওর অলককে বলেছিলো যে তুমি রাতের আঁধারে আমার কাছে একটি লণ্ঠন নিয়ে আসবে। অলক বলে : সেটা কেন ? চাঁদের আলোতে আসবো। কমলালেবুর বাগানে। মিঠে সুবাসে মাতবে মন।

ও বলে : না , তুমি অমাবস্যার রাতে আসবে একটি লণ্ঠন নিয়ে। আমি তোমার পদধ্বনি শোনার অপেক্ষায় থাকবো। তারপর সবুজ ধানক্ষেতের আল বেয়ে তুমি একটি হলদে লণ্ঠন হাতে আসবে , আকাশে তখন পূর্ণ চন্দ্র অস্ত গেছে। দিবাকর গভীর ঘুমে। ঘুমায় সূর্যের আভা , রাতপাখি , তার ডানার হিম , পরীরা , ডাকিনী ও প্রেতিনীরা।
শুধু তুমি ও আমি।
তুমি মিথকথন হয়ে আসবে বারেবারে।

অলক বোঝেনি। ও ভাঙতে ও গড়তে জানেনা। ও তো স্রষ্টা নয়। ও একজন মানুষ। ভীষণ মানুষ। ও কথার খেলা বোঝেনা। শব্দের জাদুকর নয়। ও শুধু আবেগ বোঝে। ও গাঢ় তমসায় জোনাকি হতে পারেনা। একরাত মহুয়া কুড়াতে জানেনা।

এক আঁজলা আলো তুলে মাটির কলস ভরতে পারেনা। পথপাশ থেকে মোম আলো কুড়িয়ে খোঁপায় গুঁজতে জানেনা। বলে : ছেলেরা খোঁপা বাঁধে নাকি ?

মীরা শুধায় : তুমি কাফকার মেটামরফসিস পড়নি ? মানুষের গুবরে পোকা হওয়া দেখেছো ? তুমি বনময়ূর হতে পারো ? আমার জন্যে পেখম মেলবে ?

ওর কাছে এগুলো অবাস্তব। তবুও ওকে ভালোবেসেছিলো মীরা। দুজনের কিছুতেই মিল ছিলো না। ও ভেষজ নিয়ে কাজ করে। ন্যাচারোপ্যাথ। হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র কিছু পড়েছে। আর মীরা লেখে। বা সাহিত্য ওর বিষয়। ওকে অলক কারিগর বলতো , কবিতা কারিগর। ও রেগে যেতে। ক্ষেপে যেতো। বলতো : আমি স্রষ্টা। মিস্ত্রী নই। ডোন্ট কল মি কারিগর। চুন বালি সুড়কি দিয়ে কবিতা গড়ি না !

অলক হাসতো : হা হা হা , জাস্ট মজা করছি।

তারপর দুষ্টু হেসে বলতো : যদি এতই ক্রিয়েটিভ তাহলে এরকম একটি বাজে নাম দিয়েছো কেন ? অলক ? যার অর্থ হেয়ার ??

এবার হাসবার পালা মীরার। পালটা হাসে। হেসে বলে : অলক মানে গোবর গণেশ,যাকে আমি লক করিনা কদাচ। অ- লক। আই কান্ট লক ফর আ সেকেন্ড। চুল নয়। দেখো যে যেমন সেরকমই চিন্তা করে ! ধরতে পারোনি।
আমার থট ওয়েভস্ এ তুমি সদা উজ্জ্বল। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতন।

তারপরে দুজনেই হেসে ওঠে।

২৬।

ওখানে একটি আদিবাসী গোষ্ঠি আছে তারা বড় বড় বাঁশি বানায় ইউক্যালিপ্টাস গাছের ডাল দিয়ে। নাম বন্সী। এই বন্সী বানানো দেখাও এক অভিজ্ঞতা। মীরা ও অলক বহুবার পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দেখে এসেছে। উঁইক এন্ডে। দোঁহে। দোসর। দুজনায়। মীরা হয়ত ছিলো সমর্পিতা। মনে মনে। মোহনবাঁশী নিয়ে আসবে পদ্মনাভ কোনো সে এক শাওন রাতে।

বনে ইউক্যালিপটাস গাছের ডাল কেটে তার ভেতরটি ক্লিন করে নিয়ে বাঁশি তৈরি করা হয়। যেসব বনে উঁইপোকার উপদ্রব বেশি সেসব অরণ্যে গিয়ে ওরা এইসব ডাল সংগ্রহ করে। গাছের গায়ে বিভিন্ন বস্তু দিয়ে ঠুকেঠুকে দেখে নেয় কোনটা ঠিক ফাঁকা ডাল। কতটা ফাঁকা তাও বোঝার ব্যবস্থা আছে ওদের। সেই ডাল কেটে নিয়ে এসে ওরা বাঁশি বানায়। তারপর মুখের কাছে সরু একটি আকৃতি করে তাতে ঠোঁট লাগিয়ে সুরের হিল্লোল তোলে। কল্লোলে মাতে ভুবন। সুরটা মিহি নয় একটু ভারী।

বাঁশির গায়ে সুন্দর রং দিয়ে আঁকিবুকি কাটা হয়। কিছুটা আদিবাসী শিল্প আবার কিছুটা এলোমেলো। রং গুলি খুবই ঝলমলে। আকাশী নীল। উজ্জ্বল লাল। কমলা। সফেন সাদা। অথবা গাঢ় কালো। বেশ লাগে। চোখে লাগে না। আরাম হয়।

গাছের ছাল থেকে আবার ওরা নানান হস্ত শিল্প তৈরি করে তাতেও শিল্পের ছোঁয়া থাকে। অনেকে আবার ওতে ছোট ছোট কবিতা ও গান লিখে রাখে। স্বরচিত। সেখানেও রং গুলি খুবই উজ্জ্বল। আজকাল নাকি শহরের বাবুরা মোটা টাকায় ওদের থেকে এগুলি কিনে নিয়ে যায়। সেসব ঠিক আছে কিন্তু অনেকে আবার ওগুলিতে শহরে ছোঁয়া দিতে বলে যা ওদের পছন্দ নয়। ওরা ওদের মতন। ওখানে শহরের বিষ ওরা ঢালবে না। ওদের মধ্যে একজন আছে নাম তার *নত্যো পাহাড়ু ডব্বো*। সে বললো : দিদি বলো আমাদের তো এগুলান খাইবার জন্যে না। শকে করি। উঁদের কতা শুনবো ক্যান ? মীরা হেসে বলে : *নত্যো পাহাড়ু* যা বলে ঠিক বলে। উঁদের কতা শুনার দরকার লাই। তুর মন যা কয় তাই করিস।

নত্যো পাহাড়ু ডব্বো পানের ডিব্বা খুলে ক্ষয়াটে দাঁত বার করে হাসে। আজব খিচুরি পাকিয়েছে ওর বৌ রাঙতা ডব্বো। শালপাতার ঠোঙায় দিলো। খেলো , মীরা ও অলক। মোটা চালে ও ডালে,বেশি হলুদ তাই গন্ধ নাকে লাগে আর সাথে বুনো লঙ্কা ভাজা। ভদ্দরনোক যারে কয় ক্যাপছিকাম।

মনের মাধুরিতে সুস্বাদু।

২৭।

চন্ডী মৈত্রের কনিষ্ঠা কন্যা তনুজা কিছুদিন উত্তরপূর্ব ভারতে কাজ করেছিলো । ও প্রোডাকশান ইঞ্জিনীয়ার । মেয়ে বলে ওকে পেপার ওয়ার্ক দেয় । ও বেঁকে বসে । বলে : পেপার ওয়ার্কই যদি করবো তাহলে প্রযুক্তিবিদ হলাম কেন ? আমি ফ্যাক্টরিতে কাজ নেবো । আমি বসে বসে মেয়েলি ধরণের কোনো কাজ করবো না ।

এই নিয়ে ওর বসের সাথে খুব বচসা হয় ওর বা বলা ভালো নিয়মিত হত । বেশ কিছুকাল ও বাড়িতেই বসে থাকে । কাজে যেতো না । একদিন এরকমও ভাবে যে কাজ ছেড়ে দেবে , শেষে ওকে বস ডেকে পাঠান ।

তার আগে অবশ্যি ও কিছুদিন নেপালের থারু গ্রামে গিয়ে ঘুরে আসে । হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে এই থারু সম্প্রদায়ের বাস । এরা আদিবাসী । বেশ কিছু জনজাতি আছে এদের । সচরাচর বাইরের জগতে হানা দেয়না । চাষবাস করেই কাটায় ।

বনজ ফলমূল খেয়ে থাকে । ধান , সর্ষে , ডাল , ভুট্টা চাষ করে । ভেষজ ওষুধ বন থেকে সংগ্রহ করে । হরিণ , বুনো শূকর , খরগোশ ও মৎস্য শিকার করে ।

রাণা থারুগণ একসাথে ৪০ কিংবা ৫০ জন মিলে থাকে ও কাজ করে টাকা ভাগ করে নেয় । তারা একই রসুইঘরে রাঁধে , লম্বা লম্বা বাড়িতে থাকে । এরা সেচের জন্যে ১০০

বছর আগেই কোনো দামী যন্ত্রপাতি ব্যাতীত লম্বা লম্বা খাল তৈরি করে যা দিয়ে বহু এলাকায় সেচের জল সরবারহ করা চলে। এই অপূর্ব কর্মটি দেখতেই একজন প্রযুক্তিবিদ হিসেবে তনুজার ওখানে আদতে গমন। ওখানে মৈথিলী , ভোজপুরি ক্ষেত্রবিশেষে উর্দু এইসব চলে। পাহাড়ি ও সাধারণ মানুষ তরাই এলাকায় গেলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেও থারুরা হয়না। ওদের এই রোগ কাবু করতে অক্ষম। গবেষণা বলে ওদের এক ধরণের বিশেষ জিন আছে দেহে যা এতে সাহায্য করে। এও এক বিশেষত্ব ওদের জাতির। ওরা মশার মশালকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারে। তনুজা থারু গ্রাম থেকে ফিরে বাড়িতেই ছিলো।

তনুজা খুব রূপসী। ওকে দেখতে অনেকটা আমাদের বাংলা সিনেমার মৃতা অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর মতন। টিকোলো নাক , সুন্দর আঁখি যুগল। কিন্তু নিজের রূপের দিকে ওর কোনো হুঁশ ছিলো না। এইজন্যে ওর মা ওকে তিরস্কার করতেন। এত রূপবতী কিন্তু নিজের রূপ নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই।

যার বিয়ে তার হুঁশ নেই , পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

যেমন তেমন করে কাটায়। তাই যেদিন ওর বস ওকে উত্তর পুর্ব ভারতে প্রোডাকশান এর কাজে একটি রিমোট অঞ্চলের এক কারখানায় যেতে হুকুম দিলেন ও সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলো। যেমন ম্যালেরিয়াকে তোয়াক্কা না করেই থারু এলাকায় গেলো। এখন বললে সে বলে : সেদিন সাহস করে গিয়েছিলাম বলেই তো অত সুন্দর একটি জায়গা চাক্ষুষ করে এলাম। সবুজ বনানী , চাঁদের মায়াবী আলো , হিমালয়ের গহীন হাতছানি আর সরল জাতি থারু।

এক থারু রমণীকে ও মা ডাকে। তার নাম থুম্পা। সে ওকে বলেছে যে ফিরে গিয়ে ও যেন নিজে হাতে লিখে চিঠি দেয়। ও উত্তরে বলে : আমি তোমাকে ইমেল পাঠাবো। ফোকলা দাঁতে একগাল হাসে থুম্পা। শুধায় : সেটা কি ?

তনুজাও হাসে। হেসে বলে : ইমেল গো ইমেল। নিজের এলাকা ছেড়ে যারা বাইরে যায় না তারা কূপমন্ডুক। তাই জানো না ইমেলের কথা। আচ্ছা আমি হাতেই লিখবো। কিন্তু তুমি তো ভোজপুরি বলো আমি বাংলায় লিখবো , পড়বে কী করে ?

বুড়ি হেসে বলে : আমি আমার কৌটোতে রেখে দেবো আর তার আগে তোর চিঠি গালে ও কপালে ঠেকাবো। তোর ছোঁয়াই আমার কাছে অনেক। অক্ষর জ্ঞান আমার নেই বিটিয়া। আমি শুধু স্নেহের পরশ খুঁজি।

দুচোখ আবেগে বুজে এসেছিলো তনুজার। ঠোঁট কেঁপে ওঠে।

বস তো সেদিন বললেন : ভালো করে বাড়ি গিয়ে ভেবে জানিও ঐ ডেঞ্জারাস প্লেসে যাবে কি না। সুখের জীবন ছেড়ে।

ও কিন্তু তখনই ওর সম্মতি জানিয়ে আসে যা ওর মায়ের বিশেষ করে একটুও পছন্দ ছিলো না। তারপর একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে চলে গেলো বিমানে চেপে।

ওখানে গিয়ে জিপ নিয়ে গেলো কারখানায়। তা অনেকটা পথ নাকি। টেলিফোনে কথা হত।

সেই জিপে এসকর্ট হিসেবে থাকতো উগ্রপন্থীরা। ওরা নাকি ভাড়া খাটে কারখানার মালিকের। এক একটি ফ্যাক্টরি এক একজন সংগঠনের থেকে লোক নেয়। যাতে অন্য টেররিস্ট গ্রুপ উপদ্রব না করতে পারে। ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও ওরা হানা দেয়।

সরকার ওদের দেখেন নি। তাই ওরা আজ উগ্রহানার দলে। সাধারণ মানুষ ওদের সাহায্য নিয়ে বেঁচে আছেন। জঙ্গী হয়ত নামে , কাজে কিন্তু অন্য। কখনো কখনো উপকারে লাগে। যস্মিন দেশে যদাচার।

সেখানে সাত পাহাড় ডিঙিয়ে ওকে ফ্যাক্টরি তে যেতে হত । কোনো সোসাইটি নেই , লাইফ নেই । মাইনে অনেক । মাসে পাকা ১ লাখ । সুবিধে অনেক । কোয়ার্টার ফ্রি । লোক লস্কর ফ্রি । তবে হোটেল রেস্তোরাঁ নেই । রান্না করতেই হয় । কেনার উপায় নেই ইচ্ছে হলেও । এরচেয়ে অবশ্য ওর থারু গ্রাম বেশি ভালো লাগতো । ওখানে ওর এক মা আছেন । অসুখে বিসুখে ঠ্যাকা বে-ঠ্যাকায় ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ানো চলে । মাথায় হাত বুলিয়ে দেন । রাঁধা খাবার মুখের কাছে । মায়ের আঁচল বিছানো চারদিকে । ওর মনে হয় মেয়ে হবার বেসিক ক্রাইটেরিয়া হল স্নেহ ও মমতা । নারীবাদীরা অবশ্য শুনলে ক্ষেপে যাবেন । ও নিজে খুবই স্বাধীনচেতা তবে স্বেচ্ছাচারী নয় । ও ফেমিনিস্ট নয় । কোনো নিস্ট-ই নয় , কমিউনিস্ট , ক্যাপিটালিস্ট --। ও মানুষ ।

২৮।

তনুজা অবশ্য খুবই উপভোগ করতো। ওর অনেক বন্ধু ছিলো ওখানে। একসাথে কাজ করতো। ও খুব সাহসী। আগে ও গুজরাটে ছিলো। প্রথমে। ওদিকে নানান জায়গায় কাজের সময় আরব সাগরে ও সাঁতার কেটেছিলো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের হয়ে। খুব সাহসী মেয়ে বলে অফিসে পরিচিতা ছিলো। অন্য কলিগদের স্ত্রীরা ওকে ঈর্ষা করতো।

- আমাদের পতিকে বাগিয়ে নিও না যেন !
- আমরা মসীজীবি , তোমার মতন সাঁতরাতে জানিনা , তাও মাঝ সমুদ্রে।
- তুমি তো আবার মিস ইউনিভার্স কনটেস্টেও নামতে পারো এত রূপ তোমার !

এইসব তির্যক মন্তব্য ভেসে আসতো বাতাসে। ও গায়ে মাখতো না। পরে উত্তরপূর্ব ভারতের দিকে চলে যায় বেশি অর্থের জন্যে। বসের কারণে। চ্যালেঞ্জিং কাজ।

প্রোডাকশানের কাজ , যা ও শিখেছে। আগে পেপার ওয়ার্ক নিয়ে খিটিমিটি হলেও ও করতো যন্ত্র দেখভাল। এখন খোদ প্রোডাকশান।

অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় চুলহা্র ধারে ওকে থাকতে হত। নখ পুড়ে যায়। মুখচোখের দশা আম্ড়াতলার পেত্নীর মতন।মা ওর চেহারা দেখে আঁতকে ওঠেন।

- এই মেয়ের আমি বিয়ে দেবো কী করে ?

ওর বন্ধু দুষ্টুমি করে বলে ওঠে : কেন আজকাল আন্তর্জালের যুগে একটি টোগো , ঘানার পাত্র জুটিয়ে ফেলো । বিদেশী জামাই প্লাস মেয়ের হিল্লে হয়ে যাবে আবার দেখো নাতনি হলে মিস ইউনিভার্স হবার ১০০ ভাগ চান্স । এরাই তো এখন বিশ্বসুন্দরী , হেলেন অফ ট্রয় ফয় সব গোল্লায় গেছে !

আগুনে পোড়া রূপেও মেয়ে দমে না । কাজ করেই যায় । অসীম সাহসী ও কর্মক্ষম ছিলো সে । বহুদিন গৃহ ছাড়া । আত্মীয় পরিজন থেকে এত দূরে একা একটি মেয়ে , রূপবতী , বাঙালি মেয়ে -যাকে ঘিরে আছে উগ্রপন্থী -- খুবই অদ্ভুত শোনায় , তাই না ?

চন্ডী মৈত্র ফিরে আসার কথা বলেছেন । জানতেন মেয়ে শুনবে না । সে খুব জেদী । তবুও বলতেন : মা , জানিস তো -মেয়েদের রূপ চলে গেলে ছাপোষা বাঙালি ঘরে বিয়ে দিতে মুস্কিল । আমার কথাটা ভেবে দেখিস ।

পরে মেয়ে বিয়ে করলো ওর ফেসবুকের এক বন্ধুকে । সে বিদেশে থাকে । অ্যাফ্রিকান । ছেলেটি খুবই মার্জিত । পেশায় ডায়বেটিজের চিকিৎসক । ওরা কিনিয়ার মানুষ । নাই বা হল টোগো বা ঘানা । কিনিয়া দিলো হানা ।
ওর বোন এসেছিলো , মাথায় অজস্র বিনুনী । নাম আহ্পিয়ো ।
তনুজা যার নাম সেই মেয়ে এখন সুখী । ঘরকন্না নিয়ে আছে ।

২৯।

অলকের ভাই ভালোবেসেছিলো একটি মেয়েকে যে বৌদ্ধ্য । তার নাম অসীমা । অসীমা বড়ুয়া । সে বাংলাদেশের মেয়ে । ওর বাবা ওখানে কোনো কোর্টের জজ । খুব কড়া ধাঁচের মানুষ । মনে করেন ওদের সম্প্রদায়ের বাইরে বেশির ভাগ লোকই মন্দ । যৌনতা বিবাহের বাইরে মন্দ , সাহিত্যে যৌনতা আরো মন্দ । পার্ভার্শান ।
বিবাহের বাইরে যৌনতা একক , সাহিত্যে বহুমুখী । তাই ওটি বেশ খারাপ ।
নিজের মেয়ের বিয়ে কোনো ভিনদেশী ও মুসলিম ছেলের সাথে কল্পনার বাইরে ।

মেয়েকে গুন্ডা দ্বারা মেরে ফেলবেন । তাই ওর মা ওকে বারণ করেন এই সম্পর্ক টেনে যেতে । বলেন : ওকে ভুলে যাও । অসীমা ওকে ডাকতো মুসা বলে । ওর মা বলেন : মুসাকে ভুলে যাও সোনা ।

ওর দাঁড়ি গোঁফওয়ালা চেহারা , ফর্সা মুখ দেখে ওর মায়ের ভালোলাগলেও ওর বাপের ভয়ে কিছু করার উপায় নেই । মেয়ের মুখে মেঘ । তবুও । ওর বাবা সাংঘাতিক । মেরেই ফেলবেন ওদের । সবার জীবন স্ট্রেট লাইনে চলেনা । সবাই সরলরেখায় বাস করেন না । বক্র জীবন ওর , বলা ভালো ওদের । তাই মনের মানুষকে ভুলে গেলো সে । মুসা রয়ে গেলো মসীতে । মসীর চিত্র হয়ে , পাতায় পাতায় । ঝরাপাতা হয়ে, কোনো এক চৈত্র বিকেলের -লাল দিগন্তে । বসন্ত আর এলো না ওদের আঙিনায় । লিপস্টিক লাগিয়ে

ঠোঁটের চিহ্ন আঁকা চিঠি কিংবা মুসার সূর্মা আঁকা চোখের কালো কালি প্রেমপত্রের নিচে লেপে দেওয়া, রয়ে গেলো অচেনা সৈকতের পদচিহ্ন হয়েই । যেই পথে কেউ আর কোনোদিন পা বাড়াবে না ! জজ বাবা আর স্নেহশীলা মা দুই মেরুর দুই বাসিন্দা । মাঝে অসীমা । ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা কি ওর বাবা অন্তর থেকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন ? তাহলে ভালোবাসাকে হেলায় ঠেলে দিলেন কীভাবে ? মঠে গিয়ে নিজেকে উনি আবার উঁচুস্বরে বৌদ্ধ্য বলেন? অসীমার মনে হয় এঁদের নিজেদেরকে বৌদ্ধ্য নয় বুদ্ধু বলা উচিৎ! তথাগত কিন্তু বলেছেন: সবাইকে ভালোবাসো ,অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো , এই কি তার নমুনা ? শুধু মঠে কিংবা পুঁথিতে থাকে শিক্ষা ? জীবনের পথে তাকে নিয়ে আসা , বাস্তবে ঠাঁই দেওয়ার প্রয়োজন নেই ? এই অল্প বয়সে মেয়েটি যা বোঝে এঁদের মতন রথী মহারথী তা বোঝে না কেন ? কেন হারিয়ে যায় মুসারা -অসীমাদের জীবন থেকে ? কেন ? কেন ? কেন ? সেদিনই হাজার হাজার বৌদ্ধ্য মঠ প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে যেদিন একজনও অসীমা আর হারাবে না কোনো মুসাকে ।

সীমার মাঝে সেদিনই ধরা দেবে অসীম ।

৩০।

কুন্দন আজকাল একটি মেয়ের সাথে খুব মজেছে। আগেও ভাব ছিলো কিন্তু যোগিনীর অপছন্দের বলে বেশি মিশতো না। মেয়েটি অফিসে কাজ করে। সাধারণ ঘরের মেয়ে, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট পড়ে এসেছে। শর্ট স্কার্ট, ক্লিভেজ খোলা জামা পরে আসে। নিজেকে উন্মুক্ত করে রাখে। একটু সেক্সি। নাম রাকা রয়।

বাবা নাকি একটি স্কাউন্ড্রেল। একটি কোম্পানিতে কাজ করতো। সেখান থেকে অনেক টাকা সরিয়ে পালায়। পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। অন্যত্র আর চাকরি পায়না। বাকি জীবন মদ্যপ হয়ে কাটায়। বাড়িতে খোলা বন্দুক নিয়ে ঘুরতো। একটি বাগানে গার্ডেন মেন্টেন করার কাজ করতো। অল্প ইনকাম হত। ওর পত্নীর নাম কেয়া। কেয়া রয়। রেডিও তে গান করে। লোকগীতি। আর অবসরে স্কুলে পড়ায়। একটি হিন্দী স্কুল। সেই আয়ে দুই সন্তানকে মানুষ করেছে। রাকার ভাইও এখানেই কাজ করে। এই টিসি কোম্পানিতে। সে হিসাব নিকেষ বিভাগে আছে। ছেলেটি ভালো। নাম রোহন।
বিকেলে নাকি রাকা ও কুন্দন একসাথে নিচে কাফেতে খেতে যায়, রোজ।
সন্ধ্যায় কুন্দন -কাজ না থাকলে, ওর ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাকাকে ডাকে। কিভাবে ?

না ও যদি তিনবার আলো জ্বালায় ও নেভায় রাকা বোঝে যে ও তাকে ওখানে ডাকছে। ঘর দুটি সামনসামনি। দেখা যায়। ও উঠে যায়। তারপরে ওরা নাকি ওখানে ঘনিষ্ঠ হয়। অফিসের মধ্যে এইসব অনেকের ভালো লাগেনি।

মালিক হিসেবে কুন্দনের কিউবিকেল নয় একটি বড়সড় ঘর আছে। তবে ও কোনো সেক্রেটারি ওর পাশে রাখেনি। যে আছে সে একটু দূরে বসে। তার নাম জোয়ানা। সে অ্যাংলো মেয়ে। মেয়েটি বেশ ভালো। হাসিখুশি। সে আবার মাঝে মাঝে মারধোর খেয়ে অফিসে আসে। তার বর তাকে বেধড়ক মারে। ছেলেমেয়েদের দেখেনা। দুটি আছে। তাই জোয়ানা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ডাইভোর্স করেনি। সে মাঝেমাঝে এসে ওকে মারে। জোয়ানা অন্য এক বন্ধুর সাথে আজকাল থাকে তাই হিংসায় ও এসে ওর বাড়িতে অত্যাচার শুরু করে। মাছের জার ভেঙে দেয়। টিভি ভাঙে। এইসব করে। সেই মেয়েটি দেখেছে যে কুন্দন ও রাকা বেশ ক্লোজ হয়েছে যোগিনী না থাকায়।
বনে বুঝি ফুটলো কুসুম এবার তবে !

৩১।

কুন্দন আগেও রাকাকে আলো জ্বালিয়ে ডাকতো তবে যোগিনী রাজি না থাকায় বেশি মিশতো না। গোপন প্রেম আর কি। আজকাল মেশে তবে আলো জ্বালানোর ব্যাপারটা যেন হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেছে। ওর ভালোলাগতো এই সুন্দর জিনিসটা। এখন আর করেনা কুন্দন এটা, ঐ অ্যাক্সিডেন্টের পরে। হয়ত মাথায় চোট লেগে ভুলে গেছে!

দুর্ঘটনার পরে ওর স্বভাবও অনেক বদলে গেছে। ও অনেক সাহসী ও অ্যাগ্রেসিভ এখন। আগে ও বিনয়ী ও কমপ্যাশনেট ছিলো। এখন ও কোম্পানির পলিসি মেকিং এর সময় খুব অ্যাগ্রেসিভ। প্রফিট ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যোগিনী ছিলেন বিজনেসের সোসাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে ভাবার মানুষ আর কুন্দন তখন ওতে সায় দিতো। কিন্তু এখন সে অন্য মানুষ। এবার সে বলে যে ব্যবসাদার শুধু লাভ দেখবে আর LOVE বলে রাকার গালে চুমু এঁকে দেয়। বলে ও অ্যান্ট পলিসি নয় জেট পলিসিতে বিশ্বাসী। যা দিয়ে ওরা তরতরিয়ে সাফল্যের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাবে। আজকাল সে খুব সিগার পান করে।

- ইউ নটি বিং!

  রাকা পাল্টা হাসি দেয়।

  ইয়েস আই অ্যাম নটি বিং, ওয়েল সেড, নট সুপ্রিম বিং। ইউ নো হোয়াট রাকা, অল ইজ মায়া, সব মায়া, তবে মায়াতেই আমরা মোড়া বলে তাকে আমরা

ভালোবাসি --আমি তুমি এই বিজনেস , প্রপার্টি , সব কিছু কনশাসনেসের পার্ট, সুপ্রিম কনশাসনেসের । যদি থট প্রসেস কে পুরোপুরি অ্যারেস্ট করতে পারো তুমি ইটার্নিটিতে মিলে যাবে । সব ভ্যানিশ হয়ে যাবে এই ক্রিয়েশান , বিজনেস , রাকা -সোনার কেল্লার মুকুলের দুষ্টু লোকের মতন ।
জিজ্ঞু বলে । জে কৃষ্ণমুর্তি । হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট হিম ?

- ইয়েস বাট আই হ্যাভ নট রেড হিজ বুকস্ ।

- ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু । সব বইয়ের সারমর্মই হল অল ইজ মায়া । দেন হোয়াই অন আর্থ অ্যাম আই হিয়ার ? বলে রাকাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলো ।

তারপর পাশের সোফায় শুইয়ে দিলো আলতো করে । ওর গ্রীবায় চুমু খেতে খেতে দু এক কলি এল্টন জন বা ক্লিফ রিচার্ড --- বাইরে তখন অঝোর ধারায় শ্রাবণের তরলিত চন্দ্রিকা , চন্দন বর্ণা ।

ওর সিগারের গন্ধটা রাকার তেমন ভালোলাগে না । ওর ভয়েসটিও আগের চেয়ে কেমন বসে গেছে । আগে বেশ উন্মুক্ত , উদাত্ত কণ্ঠে কথা হত । এখন একটু হাস্কি ভয়েস হয়ে গেছে ।

একটি অ্যাক্সিডেন্ট কতকিছু বদলায় !

৩২।

মোদি শেষ অনেকগুলি বছর হইল চেয়ার-এ চলাফেরা করতো। ওর তো দুটি পা ছিলো না। অ্যাক্সিডেন্টে হারিয়ে যায় চিরতরে। কোনো এক সন্ধ্যায় ও নিজ বান্ধবীকে নিয়ে এক আশ্রমে গিয়ে পবিত্রতার মাঝে রতিক্রিড়ায় মাতে। স্বর্ণালী সন্ধ্যা আবেশে ভরে ওঠে। ওরা বিবাহিত ছিলো না। এইভাবে বেশ কিছুকাল চলে। ওর বন্ধুরা বলে : কার্স লেগে গিয়েছিলো তোর ঐ সাধু বাবার।

মোদি আজ আর নেই। কিন্তু বড় ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তা বলতো। মোদি অবশ্যই সিগার খেতো খুব। কুন্দন ওর থেকে শিখেছে। জে কৃষ্ণমূর্তি , কাহলিল জিব্রান , ইউ জি কৃষ্ণমূর্তি , স্বামী রামতীর্থ এদের নেশায় মেতে ছিলো। বই পড়তো। নিরামিষ খেতো। কালীমন্দিরে ডোনেট করতো।
একবার তো পুরো মাথা ন্যাড়া করে আসে। সাধু হবার আছিলায়।

ম্যানেজমেন্টের অনেক তত্ত্ব দিতো যা ওর ছাত্রেরা পরে আন্তর্জাতিক লিডিং জার্নালে দেখতো কিন্তু সেইসব নিয়ে এই মাস্টারের কোনো হুঁশ ছিলো না। ওর মতে এই জীবন পদ্মপত্রের নীর। এই জীবন নিয়ে বেশি মাতামাতি না করে আর্তের সেবা করো আর ঈশ্বরের ধ্যান। পরে অবশ্য কামিনী ও কাঞ্চনে ডুবলো।
আমেরিকায় গিয়েই তো সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা যাতে হারালো প্রাণ। পিতৃদত্ত প্রাণ।

আগে গেলো পা দুখানি পরে একমাত্র প্রাণ। ওরা এমনি খুবই ধনী। ওদের বাড়িতে বিশাল একটি পিয়ানো ছিলো। ওর দাদু উইন্ডন দেখতে যেতেন।
তবুও এই মানুষটি ভিন্ন জাতের ছিলেন।
মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, অজস্র আইডিয়া মাথায়, ইনোভেশান অথচ তা প্রচার বিমুখতা আর ফিলোসফিক্যাল ভাবনা চিন্তা। এই হল মোদি।

আজ আর উনি নেই। খুলে পড়েছে একটি পাতা পুরনো ডাইরি থেকে। মোদি বিহীন তন্ত্র কর্পোরেশানের অফিস আজ খাঁ খাঁ করে। নামটি ওর নাকি খুব ভালো লাগতো। এই নামে নাকি এক জাদু আছে। কুলকুন্ডলিনী, সহস্রারা, মণিপুর চক্র, আজ্ঞা চক্র এইসব মনে পড়লে ওর গায়ে কাঁটা দেয়। সেই ফিলোসফি। সবই তো মায়া! মোদি বড় মায়াবী!

৩৩।

ওদের অফিসে একটি ছেলে তার হবু সন্তানের জন্মের আগেই ইউ -টিউবে ওর স্ত্রীর গর্ভস্থ বাচ্চার আল্ট্রা সাউন্ডের চিত্র তুলে দেওয়াতে একজন বললেন : তোমার সন্তান বড় হয়ে তোমায় লিগাল কেসে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। কেন করতে গেলে এগুলি ?
ওর প্রাইভেসির ব্যাপার আছে।

সেই লোকটি যার নাম মধুময় হাজারিকা সে বলে : দাদা আজকাল সবার জীবন ওপেন বুক। সবাই সব কিছু জানে। রহস্য বলে কিছুই নেই। তাই করেছি। প্রাইভেসি আজ হিস্ট্রি , আর দেখুন না ইতিহাস তো লোকে বিকৃত করে। রাজনীতির একটি বড় ভূমিকা আছে এই ব্যাপারে। ঐতিহাসিকদের উপেক্ষা করে এই কাজ করে। যেমন ফার্মাসিস্ট ও চিকিৎসকদের কথা না শুনে ওষুধ কোম্পানিগুলি লোক ঠকানো ব্যবসা ফাঁদে , মুনাফার জন্যে। এই দেখুন না এই আমাদের অফিসে এখন কি শুরু হয়েছে। আগে ম্যামের জমানায় কত ভালো কাজ হয়েছে। এখন কুন্দন স্যার কি সব করছেন। আপনি সমর্থন করেন এইসব ?

যিনি আগে বক্তা ছিলেন উনি কথা ঘুরিয়ে দেন সেন্সিটিভ বিষয় দেখে।
বলেন : নো কমেন্টস। আবার হেসে বলেন : তোমার সন্তান যদি কেস করে কী করবে।
মধুময় মধুর হাসি হেসে বলে : লড়বো , যদি একান্তই করে বুড়ো বাপের বিরুদ্ধে !

মধুময়ের দাদুর বয়স ১০৩ । ওদের সাথেই নাকি উনি থাকেন । ওর এক কাজিন বঁদিপুরে যেতো । তার বয়স মধুময়ের চেয়ে অল্প বেশি । সে ওখানে মিসাইল লঞ্চের কাজে যেতো । সেখানে নাকি পর্ণো সিডি নিয়ে যেতো । সেই ঘটনা দাদুর কানে পৌঁছে গেছে কোনো ভাবে । তাই উনি আর তার মুখদর্শন করেন না । ওল্ড মানুষ কিনা !

মধুময় বলে : আচ্ছা বলুন তো দাদা সেই সময় কি মানুষ দৈহিক ভাবে মিলিত হতনা ? বাচ্চা গাছে হত ? পর্ণো সিনেমা দেখলে কি হয় ? বুড়োগুলো এত রিজিড কেন ? ব্লু - ফিল্মে ওরা একটু বেশি দেখায় এই তো ! তা আজকাল তো পথেঘাটে ! দাদুকে তো আর দেখাতে যায়নি । বিজ্ঞানী পর্ণো মুভি দেখতে পারবে না ?

সায়েন্সের সাথে পর্ণোর বিরোধ কোথায় ? ক্যামেরা , এডিটিং মানে যন্ত্র দিয়ে মুভি তৈরিই তো সায়েন্স । কিছু কিছু দেশে তো পর্ণো মুভি দেখলে মেরে ফেলে শুনেছি । ওরা বৌয়ের সাথে কি করে ? পর্ণো করে কী না ? আসলে মানুষ আন্ডার কভার সবই করে । জানেন এক ধরণের মানুষ আছে যারা জন্তু ধরে রাখে ও তাদের সাথে রমণ করে । একে বলে জুফিলিয়া ! একজন ঘোড়াকে বিয়ে করেছে । ওকে জিজ্ঞেস করায় যে মেয়ে ঘোড়া না ছেলে সে চটে যায় । বলে : অ্যাম আই আ গে ?

অর্থাৎ এও দাদুর দোসর । ব্যাটা জন্তুর সাথে মিলিত হচ্ছিস আর হোমোরা আর যাই হোক মানুষের সাথেই তো !

আদতে মানুষের ইগোর শেষ নেই । আমি ভালো তুমি মন্দ । আমার জ্ঞানের নাড়ি টনটনে সে আমি যাই করিনা কেন !

- অপরপক্ষ হেসে বলেন:অবশ্য বুড়ো হয়ে গেলে ছেলে যাতে তোমাকে ওল্ড ফেলো বলে গালি দিতেনা পারে তাই আগেভাগেই ওর জন্মরহস্য তুমি নেটে তুলে দিয়েছো ? কিন্তু ভাই পর্ণো কে লিগাল করলে আমাদের দেশে সব রসাতলে যাবে । সমস্যা কি আর কম আছে ! বাজারে এইভাবে পর্ণো ছড়িয়ে দিলে সমাজ তো গোল্লায় যাবে হে ! তোমার ওল্ড ম্যানকে আমি সমর্থন করি ।

মধুময় হাজারিকা মধুর হাসি হেসে বলে : ঠিক ধরেছেন।

- কিন্তু তা গেছে অলরেডি। আন্তর্জালের যুগে। আপনারা জানতি পারেন নাই - আমি ওটাই লিগাল করার কথা বলছি। উইকেড আইডিয়াজ। আমি হয়ত একটু ইনসেন আছি। যতদিন যাবে সব যাবে রসাতলে। এই তো ঘোরকলি। এরকমও তো শুনেছি আজকাল কাজের ফাঁকে ফাঁকেও অফিসে বসে এগুলো করে আমাদের অফিসেই। আপনি শোনেন নি কিছু ?? সিনামন হ্যারিশ কে দেখেন নি ? ৩৫০ মেয়ের সাথে শুয়েছে। শুধালে বলে আরো বেশি। আমাদের কোম্পানির লোক। ওর কাজ এটা। ও মেয়েদের খুশি করতে পারে। তাগড়াই চেহারা নয় একেবারেই সাধারণ।

হঠাৎ করে ফোন এসে গেল !

৩৪।

বীরু দারুণ আঁকে। ও বসতির ছেলে। গাঁজার কারবারি। টুকটাক। ওদের দলের পান্ডা পোলিও আক্রান্ত। বীরু আবার টিসি তে সাফাই কর্মী। ওকে মাঝে মাঝে মৈথিলী ম্যাম ডাকে। উনি ওকে খুবই স্নেহ করেন। ওর আঁকা দেখতে চান। আসলে যোগিনী থাকতে থাকতেই ও ওদের সুবিশাল বাড়িটিতে প্রবেশের অধিকার পায়। যোগিনী তো এইসব মানুষের কাছাকাছি বাস করতো। মনটি ছিলো ভারি নরম।

বীরু একমাত্র মানুষ যাকে দেখলে মৈথিলীর ভালোলাগে। আর সবগুলো মনে হয় মুখোশ। ধনসম্পদ , উল্লাস , মদ এসবের মাঝে বীরু যেন একমুঠো তাজা শিউলি।

ওর কাঁচা রঃ- এ আঁকা ছবিগুলো কী ভীষণ জীবন্ত। যেন ফিদা হুসেনের বিখ্যাত ছবিগুলো যা দিয়ে ওদের বাড়ি সুসজ্জিত তাকে ভেদ করে চলে যায়। মর্মভেদী ছবি। আসলে সবকিছুই তো মানুষের মনে মনে। পুরো দুনিয়াটাই আপেক্ষিক। রিলেটিভ। তাই কেউ বাঁচেন রেমব্রান্টে কেউবা মধুবনী চিত্রকলায়।

বীরুর ছবিতে শান্তি আছে। সরলতা আছে। এক ঝাঁক পায়রা আছে , লিচ্ছবি নারীর আদিমতা ও তামার মতন আকরিক গন্ধ আছে। ওর বড় ভালোলাগে। সব হারানোর বেদনা , কষ্টের মাঝে এই এক টুকরো আঁকড়ে ধরা। ও বীরুকে নিয়ে ঘুরতে যায়।

ওদের অভিজাত সমাজে রিলেশানশিপের কোনো স্যাংটিটি থাকেনা । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাবা ও মেয়ের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে , কোথাও দুই গে ভাই একসাথে আছে । যাদের সমাজে শ্রদ্ধার চোখে মানুষ দেখে , পুজো করে , গডের আসনে বসায় তারা কী ভীষণ মানুষ , গ্রস চরিত্র এক একটি । সেখানে এই বীরু যেন এক টুকরো ইনোসেন্ট প্রদীপ । ওকে নিয়ে কয়েকবার ও কফিশপে গেছে । লোকে হেসেছে । মুখে বিদ্রুপের হাসি ওদের :

- হু ইজ দিস রাস্টিক চ্যাপ ? দিস বাফুন ? মৈ ? ইজ হি ইওর টয় বয় লাভার ?

ওরা নাম দিতে অভ্যস্থ । সম্পর্কের নাম , মানুষের নাম , ব্যবহারের নাম । আসলে কিছুরই নাম হয়না । নাথিংনেস । শুন্য থেকে শুরু । আবার শুন্যেই শেষ । বলতো ম্যানেজার মোদি । জিড্ডুর কথা । ফিলোসফি । তবুও লোকে নাম দেয় ।

মূর্খ বীরু ফিলোসফি বোঝে । একদিন ও বলে কি জানো ? পুঁচকে ছেলেটি বলে : মৈথি দিদি , এই নামেই ডাকে , মানুষ মরে গেলেও খারাপ কাজ থেকে যায় । তাই পাপ করতে নেই । আত্মীয়দের নাম খারাপ হয় ।

- তুই গাঁজা বেচিস কেন ?

--দূর আমি তো অনাথ ।

৩৫।

আজ বীরুকে দেখে মনটা ফুরফুরে হয়ে গেছে তাই বহুদিন পরে মৈথিলী সেতার নিয়ে বসেছিলো। ঈশ্বরের ওপরে রাগ আর তত নেই। কারণ বীরু যদি অনাথ হয়েও এত গভীর কথা ভাবতে পারে তাহলে ও এত বিলাস বৈভবের মধ্যে থেকে ভালো কিছু করার কথা কেন ভাবতে পারবে না ?

সামান্য একটি কথা ওকে নাড়া দিয়ে গেলো। এইভাবেই বোধহয় মানুষ এর জীবন বদলায়। বদলে যায়। কয়েকটি কথা , সুর , ছন্দ। লয় , তাল। তারপর প্রলয়।

ওর অনেক আছে। বীরুর কিছুই নেই। অথচ ও ধনী। মৈথিলী তো নি:স্ব। বীরুর তুলনায়। ওর সেই জীবনবোধ কৈ ? ও তো মন্দ কাজ করে। পথঘাট থেকে পুরুষ যৌনকর্মী নিয়ে আসে নিজ ক্ষুধা মেটানোর তাড়নায়। অলস দিন যাপন করে। অথচ ওর অর্থ দিয়ে ও কিছু সামাজিক কাজ করতে পারে যা যোগিনি শুরু করেছিলো। ওকে ঈশ্বর তো অনেক দিয়েছেন। কজন পায় এত ? বেশির ভাগ মানুষ তো সামান্য ভাত কাপড়ের সন্ধানেই জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত লড়াই করে যায়। আজ মৈথিলী আত্ম জাগরণের কারণে আপ্লুত। তাই সেতারে পড়েছে টান।

সুরের মূর্চ্ছনায় মেতেছে ভুবন। সে ভালো মেয়ে হয়ে যাবে। আবার হাসবে। বাঁচবে। খেলবে ধুলবে। কিছুদিন নাহয় বিদেশে ঘুরে আসবে। ওর এক বান্ধবী আছে সে ভাস্কর। মূর্তি বানায়। তাকে নিয়ে যাবে। যদি যায়। নাম মোনালিসা।

ও বলে : ভিক্ষির মোনালিসায় গড প্রাণ ঢেলে পাঠিয়েছেন।

ওর খুব কাছের মানুষ। বেশ নাম আছে এই ফিল্ডে। ও তন্তু দিয়ে নানান মূর্তি বানায়। বলে তন্তুতে প্রাণ আছে। পাথরের নাকি সেন্স আছে ওর কাছেই শুনেছে। হিন্দুদের নানান মূর্তি সৃষ্টির সময় নাকি ওরা পাথরের প্রাণ দেখে তবে সেই পাথর নির্বাচন করেন। কোন পাথরে প্রাণ ও সেন্স আছে তা দেখার নানা কৌশল আছে। ওকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলো মৈথিলী : দেখতো মোনা আমার প্রাণ আছে কিনা ! মোনা বলে ওঠে ভ্রূ নাচিয়ে : এখনও আছে। তবে প্রাণবল্লভ জুটলে প্রাণ মেতে উঠবে। মৈথিলী কপট রাগে ওকে ঠেলে ফেলে দেয়। বলে : ইউ মোনা কি বাচ্চি তা এই জীবনে হবেনা আর , কেন বড় পার্টির আশায় , বড় কেক , আওয়াধি বিরিয়ানির আশায় ?? হঠাৎ বিয়ে , প্রেম এসব কেন ডার্লিং ??

শহর ছাড়ার আগে বাজার করতে গেলো , সেখানেই পথে দেখা সুভদ্রা আন্টির সাথে। উনি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। ধূসর দেশে আর নেই। এখন শহরে আছেন। মৈথিলীকে চিনতে পারেন নি। মৈথিলী ওকে দেখে চিনেছে ওঁর পেটেন্ট সাজ দেখে। সাধারণ ভাবে পরা শাড়ি। কুচি দিয়ে নয় , আর গম্ভীর মুখখানি। আসলে উনি এই বাজারের পাশ দিয়ে ছেলের সাথে যাচ্ছিলেন। ছেলেকে খুঁজে পেয়েছেন উনি যদিও সে বিষাদ রোগাক্রান্ত। ওষুধ পথ্যি খেয়ে সুস্থ। কাজ করে একটি কলেজে। ওখানে সে পড়ায় অংক ও কম্পিউটার। সেখানেই সে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছে। তাতে নিজের সম্পর্কে লিখতো। এইভাবেই একদিন গুগুলে সার্চ করে সমাজসেবার একটি ওয়েবসাইট পায় যেখানে ওর নিজ মায়ের ছবি দেখে। সুভদ্রা নামটিও সমুজ্জ্বল।
ছেলে চলে আসে মায়ের কাছে।
মা বলেন : তোমায় কত খুঁজেছি বাবা ! কোথায় চলে গিয়েছিলি ?
ছেলে বলে : আমি ইচ্ছে করে নিরুদ্দেশে চলে যাই। এই সমাজ সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে চলে যাই , আই আই টির লোভনীয় চাকরি ছেড়ে। পরে অন্য আই আই টি আমাকে নিতে চায়। আমি জয়েন করিনি। ছোট কলেজে ঢুকেছি। এদেরকে আমার বিদ্যাটা দিতে চাই। তুমিই তো শিখিয়েছিলে মানুষের জন্যে কাজ করতে আর আজ বুঝেছি যে কোনো একজন মানুষের জন্য গোটা মানবজাতির ওপরে রাগ পুষে রাখতে নেই। দুনিয়ায় শুধু দুই প্রজাতির মানুষই হয়। ভালো ও মন্দ। জাত , শ্রেনী , রং , রূপ, অর্থ কোনো কিছুই

তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মন্দ সামনে এলে ভালো খুঁজে নাও। দুই ধরণের মানুষই আছেন। কেউ তাপ দেন শীতলদিনে কেউ দাবদাহেও অঙ্গার। কাজেই নিজের ওপরে রাগ করোনা। চোরের ওপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কোনো লাভ নেই। জীবন সুন্দর, সুমধুর। ওকে উপভোগ করো। যতটা পারা যায়।

তবে এখন আমার এই অসুখটার জন্যে আমি মাঝে মাঝে ডিপ্রেসড্ থাকি। ওষুধ পথ্যি খেয়ে আবার কাজে ফিরি। আমার প্রিন্সিপ্যাল ও সহকর্মীরা খুব বোঝেন। আমাকে খুব বোঝেন ওরা। তাই এখানে টিকে গেছি। বৌদিদের হাতের রান্না আর সন্ধ্যায় আড্ডা, দীপান্বিতার শেষে ভাইফোঁটার আলতো পরশ -ভালোলাগে।

মাকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। একটি ছাত্রী এই ব্রিলিয়্যান্ট মাস্টারের খুব কাছে আসার চেষ্টায় আছে। নাম সুলোচনা লাল। অবাঙালী। মেয়েটির বাবার কাঠের গোলা আছে। আরো ব্যবসা করেন উনি বেশ অর্থবান তবে খুব একটা অভিজাত কিছু নয়। মা সামনে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরেন। অনেক কাচের চুড়ি ও ঝুমকো। এইরকম। মেয়েটি নানান ছুতো নাতায় চলে আসে। বাজার ওদের বাসা থেকে ৭-৮ কিলোমিটার দূরে। ওরা মা ছেলে হেঁটে যায়। যেদিন সুলোচনা আসে, সেও জিদ করে যায় সাথে। হাতে মাছের ব্যাগ নিয়ে ফেরে। যদিও ওরা শহরে তবুও এটা খোদ শহর নয়, একটু দূরে। সাবার্ব এরিয়া। তাই বাজার দূরে। ওদের দেখলে একটি পরিবার মনে হয়।

হয়ত কোনোদিন ওরা জোট বাঁধবে। পরিবার রূপে। কাঠের গোলার মালিকের মেয়ে হবে বাঙালী বধূ। হাতে শাঁখা, পলা পরবে ও সিঁদুরের ছোঁয়ায় ওর সিঁথি রক্তিম হয়ে উঠবে। শিমূল অশোকের লালের মতন।

৩৬।

মৈথিলী ওর স্কালপ্ট্রেস বান্ধবী মোনালিসা ও বসতির ছেলে বীরুকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে আসে। বীরু তো খুব উত্তেজিত। বিদেশে যাবে। কোনোদিন কি ভেবেছিলো সে? বিদেশ যাবে ? মৈথি দিদিভাই ওকে নিয়ে যাবেন। সাথে যাবেন আরেক প্রিয় ও বলে পিয়ো দিদাই লিসা। লিসা দিদি পাথর ঠুক ঠুক করে মূর্তি গড়েন। বড় বড় মূর্তি। তারপর তন্তু নিয়ে কত কিছু বানান। ওটাই বেশি করেন। পাথর মাঝে মাঝে -শখে। বীরু তো আঁকে তাই অবসরে দিদাই ওকে দেখায়। ওর আঁকা দেখে। রং এর ব্যাপারে বলে : তুই বড্ড কাঁচা রং মারিস। মিলিয়ে দ্যাখ। গাছ সবুজ হয় ? তোর চোখে কি আছে ? ঠুলি পড়েছে ? গাছে আরো রং আছে। ভালো করে দ্যাখ।

দিদাই ওদের রকের ভাষায় কথা বলতে পারে। মৈথি দিদি ওগুলো বলেন না। বললে খচে বোম হয়ে যান। বলেন : মুখের ভাষাটা বদলাতে হবে বীরু।

দিদাই বলেছেন ওকে একবার প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবেন। ওর গলায় একটা কালো কার পরানো আছে। কে কবে পরিয়েছিলো ও জানেনা। ওর তো কেউ নেই। জন্ম থেকে ও একা। ওর মা নাকি শৈশবে গলায় দড়ি দেয়। বাপ পলাতক। কোথায় শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে পায়ে কুষ্ঠ নিয়ে ফেরে। তারপর মা গলায় দড়ি দেয় ঐ পাপ দেখে। তাই বাপ পলাতক। বসতির সবাই ওকে মারধোর দেয় কুষ্ঠ নিয়ে ফিরেছে বলে। বীরু তখন থেকেই একা। ও গাঁজা চালান দেয়। ভালো কামায়। এখন বিদেশে এসেছে। অস্ট্রেলিয়া দারুণ জায়গা। ফাঁকা ফাঁকা। ক্যাঙ্গারু। ওরা বলে রু। লাফিয়ে হাঁটে। পোলাপান বুক

নয় পেট পকেটে থাকে। সামনে পকেট। খুব মজার। ওরা অনেক জায়গায় ঘুরলো। এদের মাংসও খায় লোকে।

ক্যাঙ্গারু নাকি সাঁঝে রাস্তা পার হয়। এইসময় খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে হয়।

নাহলে লাফিয়ে গাড়িতে এসে পড়ে। কাচ ফাচ ভেঙে যায়। আবার আহত ক্যাঙারু রাস্তায় দেখলে সাথে সাথে বনবিভাগকে খবর করা নিয়ম। নাহলে ফাইন হতে পারে।

একটি ছেলে ব্রিসবেনের দিকে গাড়ি নিয়ে যাবার সময় ক্যাঙারু এসে সামনের কাচে ধাক্কা দেয়।

ড্রাইভার বেশি আহত হননা কিন্তু বাচ্চা ছেলেটি নিহত হয়। ওর অর্গ্যান ডোনেট করে দেওয়া হয় মানুষের কল্যাণে। ওর বাবা মা নাকি এতেই ওকে হারাবার দু:খ ভুলতে পারবেন কারণ তাতে ও কিছুটা বেঁচে থাকবে অন্য লোকের মাঝে। ওর দেহের কিছু অংশ তখনও চলবে।

এখানে কমিউনিটি ফিলিং , সোসাল বাইন্ডিং খুব স্ট্রং। মৈথিলীর ভালোলাগে। ওরা দশের কথা ভাবে। দেশের জন্যে করে। আমাদের মতন ওরা স্বার্থপর নয়। শুধু নিজের ঘর গোছাই।

বেশ মজার ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু এখানে তো চিরদিন আর থাকা সম্ভব নয়। ফিরতে হবে বসতির ক্ষুদ্র ঘরে যেখানে ছাদ থেকে চুঁইয়ে জল পড়ে।

বড় একা লাগে ওখানে। মৈথি দিদি যা ভরসা। কিন্তু ওর বাড়িতেও তো সবসময় যাওয়া বা থাকা যায়না। আর দিদাই তো খুব ব্যস্ত। কখনো আঁকা দেখার জন্যে ডাকেন।

এখানে ক্যাঙারুর মাংসও খেলো। আর হাঁসের ডানা ভাজা। স্যামন নামে একটি মাছ খুব সুস্বাদু। ব্যাসা মাছটা পুরো ভেটকির মতন। ওর চপ খেলো।

খেলো নানান জাতের আলু। কোনোটা লাল , কেউ নীল , কেউ সোনালী তো কেউ সাদাটে। বা গোলাপি। সুগার রুগীরা নাকি অনায়াসে ওগুলি খেতে পারে।

ওদের ওখানে এক মাসির বরের সুগার ধরা পড়ায় ডাক্তার আলু খেতে বারণ করেন। গরীবের বড় খাদ্য আলু। এখানে এলে ওদের ভালো হত।

আর এখানে লঙ্কা শুধু লাল , মোটা মোটা , ডিম লাল। সাদা নয়। হাঁসের ডিম সহজে মেলেনা। কেমন দেশ গো এটা ? কিন্তু বেশ ভালো।

যদি থেকে যেতে পারতো চিরটাকাল।

মৈথিলী ও মোনালিসা দুই বান্ধবী মিলে বেড়াতে গেলো বীরুকে নিয়ে রেড বেলি নামক এক দূর্ধর্ষ ডাকাতের কীর্তিতে অমর হওয়া এক স্থান দেখতে। সে অনেক দূরে মূল শহর থেকে। ওরা মেলবোর্নে এসেছে পার্থ হয়ে। আগে ছিলো সিডনিতে।

এই ডাকাত আসলে রবিনহুডের মতন। ওর বাবাকে সামান্য পাউরুটি চুরির অপরাধে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এখানে দ্বীপান্তরিত করা হয়। পরে উনি এখানে সাজা কেটে একটি বড়লোকের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিয়ে করেন। তার আরো নটি মেয়ে ছিলো।

ভদ্রলোক এই কয়েদীর কর্মনিষ্ঠা দেখে ওকে ওর সম্পত্তির একটুকরো দান করেন। সেখানে চাষবাস করে ভালই চলছিলো। কিন্তু কি মাথায় চাপে উনি মধ্যবয়সে আবার পাশের খামারের অনেক ভেড়া ক্রমাগত চুরি করতে শুরু করেন। জেলে যান ও পরে পালান। রেড বেলি তখন কিশোর। স্কুলে একটি কিশোরকে জলে ডোবা থেকে বাঁচান নিজ জীবন বিপন্ন করে এই রেড বেলি। ওর বাবা জোসেফ বেলি তো জেলে গেলেন। দাদুর কাছে গেলো মা। দাদুর সাহায্য নিয়ে ক্ষেতের কাজ করে শিশুদের বড় করেন। কিন্তু এক শয্যার বন্ধু জুটে যায় একদা। তাতেই রেগে যান রেড বেলি। গৃহছাড়েন। পরে ডাকু হন নানান অবস্থার ফেরে এবং বেশ ইনফেমাস। খুব বুদ্ধিমান ও কেউ ধরতে পারতো না। নির্ভুল নিশানা এবং পরোপকারি। গরীবদের ধন সম্পদ বিলিয়ে দিতেন ডাকাতি করে যা পেতেন। শেষকালে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তৈরি করতে হয় ওকে ধরার জন্যে। সেই পুলিশের কয়েকটিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেন। ওখানে গিয়েছিলো মৈথিলীরা। গহীন বনের মাঝে শ্বেতপাথরে ফলক গুলি। ঝরা পাতায় ঢাকা। নাম লেখা। পাখির কুজন। একটি কাঠের বাড়ি। ওখানে একজন টুরিস্ট অফিসার বসে। পথনির্দেশ দেবার জন্যে কারণ এই স্থানটি ঘন অরণ্যের ভেতরে। কাঁচা সুড়কির পথ। পাশে বহতা নদী। পাথরের ব্রিজ। খুব শীতল আবহাওয়া। এখানে রেড লুকিয়ে ছিলেন সাথীদের নিয়ে। একজন মাত্র অফিসার পালাতে পারেন বেঁচে। সেই পরে ওকে ধরার ব্যবস্থা করেন যদিও ধরাপড়ার আগে প্রাণ খোয়ান।

রেড পরে বিচারের সময় বলেন : আমি ওদের মেরেছি কারণ ওরা আমার বোনকে মলেস্ট করতে গিয়েছিলো।

এটা সত্যি ঘটনা। যা প্রমাণিত। রেডের বক্তব্য ও অযথা কাউকে মারেনা। হয় অন্যায়ের বিচার করে কিংবা কৃপণ ধনীগুলোকে মেরে গরীবদের দেয় পয়সা।
ওর সোজা হিসাব। আর ও গড নামক কোনো ডগকে মানেনা। গডকে উল্টে দিলে ডগ হয় কিনা ? ও জানতে চায় কোর্টে।
অনেকেই হেসে ফেলেন। যার ফাঁসি কিছুকাল পরেই তার এহেন রসিকতা করা জীবনের প্রতি ক্যাজুয়াল ভঙ্গীরই পরিচয় দেয়।
--জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। ধরিত্রী নহে তোমার চির আবাসস্থল ----
কোনো কবির লাইন কি ?
ফাঁসির দড়ি গলায় পরার আগে রেড হেসে বলেন : আজ আকাশটা কি নীল। গভীর নীল। আমি একটু পরেই ওখানে চলে যাবো। বডি একটি খোলস। তোমরা শুধু শুধু খোলসটা নিয়ে খেলছো। আমার আত্মাকে হনন করতে পারবে কি? আমার স্মৃতি, আমার নাম নিয়ে লোকে বাঁচবে। আমি ফেমাস নাহলেও ইনফেমাস। যদি এই রটেন সমাজের শুদ্ধতা চাও নিজেদের বদলে ফেলো। তাহলে আর রেড বেলি জন্মাবে না। একটি দুটি রেড বেলিকে ফাঁসি দিয়ে কিছু হবেনা। পুঁথি বাবুদের বলো গিয়ে। ফাঁসিটা শেষ শব্দ নয়। নিজেদের বদলাও।

তারপর প্রজাপতির পেছনে ছোটা শুরু করেন।
অশুদ্ধ উচ্চারণে গেয়ে ওঠেন : বুড্ডাং স্মরনাং গচ্চামি !
সেটি ব্যাঙ্গাত্মক বলে কোনো ডিউটিতে থাকা প্রিজন অফিসারের মনে হয়নি। আসলে গডকে হয়ত মনে মনে মানতো।

--বুড্ডা উইল নেভার হ্যাং মি। হি উইল ফরগিভ মি আই নো। ইফ আই রিপেন্ট।

এই ছিলো তার শেষ কথা।

ফাঁসির পরে ওর করোটি নিয়ে এক বিভ্রাট। মেডিক্যাল স্কুলের মানুষ ওকে নিয়ে গবেষণা করতে চান। এইরকম দূর্ধর্ষ এক মানুষের করোটি। আর প্রিজনের অফিসার -

তারা ওটি দেবেন না। সেই নিয়ে বিরোধ। শেষকালে ওটি চুরি যায়। মর্গ থেকে। আজ অবধি কেউ ওটি পায় নি। খবরের কাগজে অবশ্যই বহুবার খবর বার হয়েছে যে পাওয়া গেছে কিন্তু সে আমাদের নেতাজীর ভস্ম পাবার মতন। বাঙালী বিশ্বাস করেনি এরাও করেনা। রেড বেলি ওদের রবিনহুড। ফাঁসিকে বহু মানুষ সমর্থন জানান নি। যাবজ্জীবন কারদণ্ডে দণ্ডিত করার কথা বলেছিলেন , ছেড়ে দেবার জন্য মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। যেন কোনো বীর। গন্ধর্ব।

মৈথিলী এরকম এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে দেখতে না পেলেও ওর নামাঙ্কিত প্রাইভেট মিউজিয়াম ও ঐসব এলাকা ঘুরে দেখেছে যেখানে ও পুলিশদের মারে।
বহুদিন যাবৎ ও বুশে লুকিয়ে ছিলো। এখানে উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে বুশ কালচার আছে। পশ্চিম দিকেও। ওরা বুশে থাকে। ক্যাঙারুর মাংস খায়। গেড়ি গুগলি খায়। শাকপাতা ইত্যাদি। অভিজাত মহলে এগুলি তত জনপ্রিয় নয়। রেড বেলি বহুদিন বুশে ছিল। সেসব দেখবার আছে। বীরু খুবই উত্তেজিত এইসব দেখে। ও বুঝেই পায়না একটি ডাকাতকে নিয়ে লোকে এত হৈচৈ করে কেন। ডাকাত কেন এত সম্মান পাচ্ছে।
ওর কচি মনে প্রভাব ফেলেছে। ও গাঁজা চালান করে টুকটাক। কিন্তু ও তো ডাকাত নয়। তাহলে যে সেদিন মৈথিদিদিকে বললো : খারাপ কাজ করলে তা থেকে যায় আত্মীয় পরিজনের নাম খারাপ হয়। এতো সেরকম নয়। একে নিয়ে সবাই মাতামাতি করছে। সিনেমা হচ্ছে , নাটক নভেল লেখা হচ্ছে। কেন এরকম ?
তখন মৈথিদিদিকে ও জিজ্ঞেস করে। তাতে দিদি বলেন যে :
না রে তুই ঠিক-ই বলেছিস। তোর কথাই ঠিক। এত বুদ্ধি কোথায় রাখিস ?
দেখ রেড বেলির আত্মীয়দের আজও চাকরি পেতে অসুবিধে হয়। কেউ ওদের সামাজিক অনুষ্ঠানে ডাকে না। একঘরে হয়ে আছে ওরা। ঐ দুর্ধর্ষ ডাকাতে বাড়ির মানুষ বলেই। কাজেই খারাপ কাজ না করাই শ্রেয়। শাস্তি দেবার জন্যে আইন আছে সর্বোপরি আছেন বিধাতা। কী বল ?
বীরু পিটপিট করে তাকায়। ওর অবসার্ভেশান সঠিক সেটাই ওর কাছে বেশি আনন্দদায়ক। রেড বেলির পরিবারে মানুষের কপালের দশা আর ভাবাচ্ছে না তেমন।

৩৭।

পার্থের দিকে ফাদার পিটার বলে একজনের সাথে আলাপ হয়েছিলো। উনি আগে পুলিশ ছিলেন। পুলিশের প্রিস্ট। খুব নম্র টিপিক্যাল পুলিশদের মতন রাফ নন। এখন এক্সরসিজম করেন ও ফাদার, বলেন: যিশুও খুব মাইল্ড ভাবে এক্সরসিজম করতেন।
ওকে বহু মানুষ এইকারণে প্রাণের হুমকি দেয়। বাড়িতে এসে ইঁট পাটকেল ছোঁড়ে। স্ত্রীকে শাসায়। উনি তবুও ভাঙেন না।
ব্যাড স্পিরিট সবাই তাড়াতে পারে না। ফাদার অতি সহজেই তাড়ান, ওঝা। ওর এত নাম আছে যে ভিনরাজ্যের লোক ওকে ডেকে নিয়ে যান। পুলিশের খুব বড় মেডেলও উনি পেয়েছেন। খুব সম্মান পেয়েছেন ওখানে। স্পিরিট তাড়ানোর কাজ করেন বিনা পয়সায়। শুধু যাতায়াতের খরচ দিতে হয় কারণ উনি অবসরপ্রাপ্ত।

ওর মুখটা দেখে আঁকতে এসেছিলো এক শিল্পী। তারা মৈথিলীরা যেই হোটেলে ছিলো সেখানে লবিতে কাজ করছিলো। সেখানেই আলাপ কারণ মোনালিসা ভাস্কর। ফাদারের

মুখটা সুন্দর। উনি রূপবান। মুখে অনেক শেডস্ আছে। দু:খ, বেদনা এরকম নয়। শুধু নির্মল ভালোবাসা। তারই শেডস্। ওর বয়স প্রায় ৮৫। দেখলে মনে হয়না। খুব মার্জিত, ঋজু ভঙ্গী আর ম্যাজিস্টিক। ওর কন্যা প্রায় ৬০।
ফাদার বলেন : আমার মেয়ে বলে : বাবা আমি তো বুড়িয়ে গেলাম।

আমি বলি : তাহলে আমাকে কি কবরে পাঠিয়ে দেবে না মমি করে ফেলবে মাই চাইল্ড? মানুষ মনে বুড়ো হয়। দেহে নয়। মনটাকে চাঙা রাখো।

কটাদিন ওর সান্নিধ্যে বেশ কাটলো। অনেক জানেন। পার্থের অনেক জায়গা ওর কাছে জেনে নিয়ে ওরা ঘুরে দেখলো। উনি বললেন : এইসব ফাইভ স্টারে না থেকে গাড়ি হায়ার করে বেড়িয়ে পড়ো। থামতে থামতে যাও। নানান জায়গা দেখতে পাবে। অনেক অভিজ্ঞতা হবে। অনেক মানুষের কাছাকাছি আসবে। যদি সময় থাকে এইভাবে বেড়াও। পাঁচতারার অন্দরে শুধু আলোর রোশনাই। ওখানে মানুষ নেই।
ফাদারকেও হাঁ করে গিলছে বীরু। সেই অপু দুর্গার ট্রেন দেখার মতন।
ও আবার কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেখছে - কি গোলাপী আপনার গায়ের রং।
তা সাহেব বলে কথা। আবার পুলিশ অফিসার ছিলেন -ও বড় মাপের মানুষ। অভিজাত। উনি বীরুর সাথে ছবি তুললেন। ওকে কিস করলেন।
পরে মৈথিলীকে বলছিলেন: একটি চার্চ আছে ওখানে বাজ পড়ে পুরো নস্যাৎ হয়ে গেছে। খ্রীষ্টধর্মের নামে ওখানে অধর্ম হত। প্রথমত ওখানে অনেক টাকা খরচ করে চার্চ তৈরি করা হয় সেই টাকা অনাথ আশ্রমে দেওয়া যেতে পারে। যীশু কি এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে আমার সন্তানদের অভুক্ত রেখে চার্চকে প্যালেস বানাবে ? আর তাছাড়া আমি শুনেছি ওখানে শিশুদের সাথে পাদ্রীমহোদয়রা অতি জঘন্য কর্ম করতেন।
বলতেন : ইট ওন্ট হার্ট ইউ মাই চাইল্ড।
তাই যিসাস নিজ হাতে দন্ড তুলে নিয়েছেন আজ।
-- ইউনিভার্স ওন্ট ফরগিভ ইউ ইফ ইউ ডু সাচ রং থিংক্স।

পথেই আলাপ আরেকজনের সাথে। সুদূর পাঞ্জাব থেকে এসেছিলো ভূপিন্দর। ভূপিন্দর সিং। ওরফে ভূপি। এখানে পড়তে। ইঞ্জিনীয়ারিং। পথে যেতে যেতে আলাপ। ফাদারের পরামর্শে ওরা একটি বড় গাড়ি নিয়ে এখন এইভাবেই ঘুরছে। ভূপি এখন ট্যাক্সি চালক। ইংলিশ বলতে অক্ষম। তাই পড়তে পারেনি। কোনো সংস্থা টাকা নিয়ে ওকে এখানে আনে। ও পড়া ছেড়ে দেয় কারণ ইংলিশ বুঝতো না। পরে গ্রামে গিয়ে চাষের কাজে হাত লাগায়। ঐভাবে ভিসা বাড়ায়। এখন ট্যাক্সি চালায়। মোটা টাকা কামায়। ভাঙা ইংলিশ বলে। অ্যাকসেন্ট তুখোড় ভাষা গোল্লা। টেন্স ও প্রিপোজিশনে ভুল হয়ে যায় খুব। হ্যাড হ্যাডটা যে কখন বসে তা আজও ওর কাছে ধোঁয়াশা। নিজের একটি বড় বাড়ি করেছে শহরের কাছে। সেখানে ওর জন্যে দম আলু আর দহি চিকেন রান্না করে অপেক্ষা করে ওর প্রেয়সী মন্দাক্রান্তা। সে আবার বাঙালী। ওরা বলে বং।

ওরই সহপাঠিনী। সে পাশ করে কাজ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ রূপে। ডিপ্লোমা কোর্স করে। মিসিং পার্সন স্কোয়াডকে সাহায্য করা , কেউ পেনশানে বা ব্যাঙ্কের ব্যাপারে জালিয়াতি করে কিনা এইসব নিয়ে কাজ করে ওরা। মেয়েটি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এসব করে এখন স্রেফ ভালোবাসায়। ওদেরই এক বন্ধু নাকি বাস চালায়। তাতে নাকি টাকা বেশি। আর ইন্টেলেক্চুয়াল কাজ করে করে ওর হাঁফ ধরে গেছে , ও আর মাথার কাজ করবে না। বাস চালাবে আর ফূর্তি করবে। এনজয় মাডি। ওদের কন্নড় ভাষায়। তুম্বা এনজয় মাডি - খুব আনন্দ করো। ছেলেটি কন্নড়। ওরা খুব সফট হয়। ওদের গাড়িতে কেউ হিট করলেও ওরা ঝামেলা পাকায় না। তো এই ছেলেটি এখন নাকি কেবল বাস চালায়।

ভূপি ওদের আগে একদিন কফি খাওয়ালো। তারপর একদিন ডিনারে ডাকলো। ওরা একটি হোটেলে ছিলো বা মোটেল বলা যায়। আসলে মোটেলই। তো সেখানে তো খাবার মেলেনা। পাশে ম্যাকডোনাল্ডস্ থেকে খাবার কিনে খেতো। অনেকে আবার এটি সস্তার দোকান বলে ঢোকেনা। প্রেস্টিজে লাগে। তাতে মৈথিলী বলে :

অ্যাঞ্জেলিনা জলি ও ব্র্যাড পিটের মতন মানুষ যখন এখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খান তখন আমার কোনো আপত্তি নেই।

ওখানে সেদিন ওরা না খেয়ে ভূপির বাসায় খেলো। আহ্ কি স্বাদ ! ভূপির বৌ বাঙালী বলে কথা। রান্না করেছিলো অবশ্যই পাঞ্জাবী স্টাইলে।
গোট কারি , ফিশ অমৃতসারি , বায়গন ভর্তা , ডাল মাখানি , পিস্তা কুলফি আরো কত কি !
খুব আড্ডা হল। মৈথিলী ওকে কার্ড দিলো। বললো : দেশে গেলে দেখা করো।
কার্ড দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া। এত বড় কোম্পানির সি ই ওর বোন সে ?
ওদের পর্ণকুটিরে আজ ? এই বসন্তে -পথভুলে তো নয় ! ছদ্মবেশী রাজাদের মতন।
ওরা ভাবছে : যথেষ্ট খাতির যত্ন হয়েছে তো ?
মনের কথা বুঝেই যেন শিল্পী মোনালিসা বলে ওঠে : মৈথির বাবা দিদি ভাইরা হয়ত খুব বড় ব্যবসাদার কিন্তু ও খুব হাম্বেল। এই যে ছেলেটিকে দেখছো না - এর বাড়ি একটি স্লামে। ও স্লামডগ - কি রে তুই স্লাম ডগ কবে মিলিওনেয়ার হবি ?
বীরু দন্তপাঁটি বার করে হেসে ওঠে - দিদাই তুমি অপমান করছো !
মোনালিসা ওকে বুকে টেনে নেয়। নিয়ে বলে : ছেলেটির কেউ নেই। এই দিদাই মানে আমি আর মৈথিলী ওর সব। কাজেই তোমাদের খাবার আমরা দারুণ এনজয় করেছি। একটু থেমে বলে আবার --

মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে , কুবেরের ভান্ডারের চাবি হাতে আছে কিনা তাই দিয়ে নয়।

এখানে আবার এক সাধু ছিলেন। শ্রীলঙ্কার তামিল ব্রাহ্মণ। কোথা থেকে এসেছিলেন জানেনা কেউ। তিনি একটি অরণ্যে একটি ময়াল সাপকে রক্ষা করতেন।
সেই সাপ নাকি ডিম খায়। বন থেকে এসে ডিম নিয়ে যেতেন। খরগোশ ও ক্ষুদ্র পাখি ইত্যাদি খায়। সেই সাপ পোষা সাপ। ফরেস্ট বিভাগকে কিছুতেই উনি দেবেন না। বহুবার ওরা ধরতে গেলে কোনো না কোনো ভাবে চমৎকারিত্বের প্রভাবে পড়ে পিছিয়ে গেছেন। সেই সাধুর নাম ম্যাড বাবা। শ্রীলঙ্কার হলেও বহুদিন নেপালে সাধনা করেন। ম্যাড বাবা নাকি এখানকার অভিজাত শপিং মলে ঢুকে চুরি করতেন। কয়েকবার ধরাও পড়েন। কিন্তু আশ্চর্য হল উনি সেইসব চুরি করা জিনিস নিয়ে পুলিশকে দিয়ে আসতেন।

আর পরের চুরি কোন এলাকায় করবেন জানিয়ে আসতেন। বলতেন : আমি দিয়ে যাবো খন দেখো।

পরে পুলিশ আর মাথা ঘামাতো না। ওদের আরো ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে।

মজার ব্যাপার হল , দেখা যেতো যে সাধুবাবা যেসব দোকানে চুরি করেন সেখানে বিক্রি বেড়ে যায়। লাভ শুরু হয় নিদারুণ ভাবে।

তাই পরেরদিকে লোকে আর কমপ্লেনও করতো না। তবে একদিন পুলিশ ওকে সত্যি ফাঁসি কাঠে ঝোলায়। সেদিন নাকি উনি মানুষের মাথা ফাটিয়ে ভক্ষণ করছিলেন। কাঁচা মাংস। উনি বলেন : এটা একটি মৃতদেহ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু মৃতদেহ পেয়ে উনি আইনের হাতে না দিয়ে নিজে খেতে শুরু করেছেন তাও কাঁচা এতেই বিস্মিত সাহেব পুলিশ কুল। বলে : ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রীলংকা আর স্ট্রেঞ্জ কান্ট্রিজ। ইউ ওয়ার্শিপ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড আর অলসো ইনভলবড্ ইন ক্যানিবালিজম।

পরে জানা যায় উনি এক অঘোরি সাধু ছিলেন যারা শিবভক্ত ও কাঁচা মাংস খেতে অভ্যস্ত। ওদের মতে সবই ব্রহ্মের অংশ। তাই ওরা এইরকম। মণিকর্ণিকার ঘাটে ভেসে আসা পচা লাশ তুলেও এদের ভক্ষণ করতে দেখা গেছে।

এদিকে খুব দাবানল লাগে। দাবদাহের আগুনের চেয়ে বেশি কেউ দুষ্টুমি করে ফেলে রাখে আগুনের টুকরো। জ্বলে যায় সব।

এরকম এক দাবানেল পুড়ে যায় একটি গোটা চিড়িয়াখানা। পশুরা মৃত।

লোকেরা সব জিনিসপত্র নিয়ে ব্যাঙ্কে রাখে যা দরকারি। কিন্তু প্রতিটি জিনিসের সাথেই তো থাকে অজস্র স্মৃতি। যদি কোনো দাবানলে ব্যাঙ্কও পুড়ে যায় তখন জিনিস হয়ত ইন্সুরেন্স কোম্পানি দেবে কিন্তু স্মৃতি টুকু ? তা কোন কোম্পানি দেবে ? মনের টান , হারানো দিন , লালায়িত কোনো কোনো স্পর্শ। স্পর্শ গুলির গন্ধ ?

এখানে একটি সারমেয়দের সমাধিক্ষেত্র দেখলো ওরা। ফুলে ফুলে ঢাকা বনের মাঝে। সবাই এসে ওদের ফুলে ভরিয়ে দিচ্ছে। প্রিয় বন্ধু মানুষের। আনকন্ডিশনাল লাভ। শুয়ে আছে ওরা চিরঘুমে। এখানে আবার ওদের বেশি কষ্ট হলে ইচ্ছামৃত্যু দেওয়া হয়।

সেরকম কয়েকজনের জন্যে কেঁদে ভাসাচ্ছেন মালিকেরা। সব দেখলো বীরু বিস্ফোরিত নেত্রে।
মৈথিলী ভাবছিলো টেক এ-ওয়ে কফির কাপ হাতে যে জগতে কতকিছু জানার ও করার আছে। সে বৃথাই এতদিন কালক্ষেপ করেছে ঈশ্বরকে দোষারোপ করে করে।
তার পরিবার পরিজন হয়ত আর নেই কিন্তু আরো কত মানুষ তো আছেন !

কে বলে ও একা ? নি:সঙ্গ ? যদি হৃদয় ভরা ভালোবাসা থাকে কেউ একা হবেন না দুনিয়াটি এতই সুন্দর করে ঈশ্বর নামক অদেখা শক্তি সাজিয়ে রেখেছেন। তবে সত্যি হৃদয় রাঙাতে হবে নির্মল ভালোবাসায়। ওর দিদি এরকম মানুষ ছিলো। যোগিনী। ওর বাবাও খুব নির্মল ছিলেন ব্যবসাদার হয়েও। অনেকটা জামশেদজী টাটার মতন। উনি শুধু ব্যবসাদার নন উনি ছিলেন একজন ভিসনারি। তাই তো আজ ওদের কোম্পানি এত বড় হতে পেরেছে। উনি বলতেন : অনেস্টি ইজ আওয়ার বিজনেস। হোয়েন বিজনেস রিয়েলি ম্যাটার্স -

যারা ভালোবাসতে জানে তাদের কোনোদিন কষ্ট হয়না। কেউ না কেউ জুটে যায়।
এই যে বাচ্চা ছেলেটি এসেছে ওর সাথে -বীরু , ওর দেশ দেখা , মৈথিলীর নিজেকে চেনা। আপন ভুবন ভুলে অন্যভুবনের সন্ধানে আকাশে পেখম মেলা।
এই ময়ূরের সন্ধান আগে পায়নি সে। আকাশ তো রোজই দেখতো।
বীরুই যেন একবার বলেছিলো মিনমিন করে : মৈথি দিদি তুমি বিদেশে ঘুরে এসো মন ভালো হয়ে যাবে। বলিউডের স্টাররা তো সবাই বিদেশ ঘুরে মন ভালো করে। তুমিও যাও না কেন ?

কথাটি মাথায় গেঁথে যায়। তারপরে সেই কথাই মাথার ও মনের আনাচে কানাচে ঘুরতে শুরু করে। শেষে একদিন প্লেনে চড়ে বসে টিকিট কেটে।
সাথে নিয়ে আসে আলোর উৎস কে। বীরুকে। আর প্রিয় বান্ধবী মোনাকে।
আজ খুব ভালো লাগছে।
পার্থের এক বাতিঘরে দাঁড়িয়ে সাঁঝের বেলা দেখেছিলো লালাভ আকাশ।

মনটা খুব সুন্দর ও ফুরফুরে হয়ে গিয়েছিলো।
এতদিনের এত বোঝা ঝট করে মন থেকে সরে গিয়েছিলো।
এক মুহূর্তে। বাতিঘরটি পরিত্যক্ত। কেউ ওখানে যায়না আর। কিন্তু সেখানে গিয়েই ও খুঁজে পেলো নিজেকে আবার। এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায়। একটু দূরে বেগুনি ফুলে ছাওয়া একটি দূরন্ত গাছ। জোছনাবুড়ো আর নীলমানবের সারি। সেই গাছের সাথে ও কথা বললো। ওকে জোছনাবুড়ো আর নীলমানবেরা বলে গেলো ফিসফিস করে : গাছের সাথে আজ কথা বলো।

কত কথাই তো হল ! ববিদির কথা। ওদের পেজ থ্রির আড্ডায় আসতেন বছর কয়েক আগে। শেষে ইন্সেন হয়ে যান। আগের স্বামীর নাম প্রমিত। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। খুবই ব্যস্ত মানুষ। এয়ারলাইন কোম্পানির। স্ত্রীর জন্যে সময় ছিলো না। ববিদি জড়িয়ে পড়েন এক রাজস্থানি ছেলের সাথে। জয়পুরের ছেলে। হীরের ব্যবসাদার। তার কাছেই ওরা শুনেছিলো যে দোকানে যা হীরে বলে বেচে তাতে আদৌ হীরে থাকে না। সমস্ত বাজে কোয়ালিটির হীরে। ১০০/ ২০০ টাকা দাম। নকল হীরা। চুনী পান্না। সাধারণ মানুষকে ঠকানো জিনিসপত্র। তাইতো আজকাল সবাই হীরা কিনতে সক্ষম। এত সস্তায় ভালো জিনিস মেলে নাকি ? আসল হীরা খুব এক্সপেনসিভ।
কোনো জেম এক্সপার্ট বা জহরি যাই বলো তাদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলেই জানা যায় এগুলি। আর ইন্টার্নেটে যা হীরা বলে বেচে সেগুলি সবই ফলস। শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। এগুলি ওরা শুনেছে ববিদির বয়ফ্রেন্ডের কাছে। পরে সেই প্রেমিক ববিদিকে ঠকিয়ে সব সম্পত্তি নিয়ে চলে যায়। ববিদির বর ওকে অনেক টাকা লিখে দিয়েছিলেন। সেইসব নিয়ে ঐ ব্যবসাদার সরে পড়ে। ববিদির একমাত্র পুত্র সাচ্চুলাল বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ওর ড্রাগসের নেশা ছিলো এছাড়া ও এক স্ল্যাটকে মন দিয়ে বসে।
তাই নিয়ে ওর মায়ের সাথে মনোমালিন্য। এইসব নিয়েই শেষকালে ববিদি ইন্সেন হয়ে গেলো। লোক চিনতে পারতো না। শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতো। পাগলের মতন খেতো। খেয়ে উঠেই আবার খেতে বসে যেতো। একদিন ওকে বলে : আমাকে পাবদা মাছের ঝোল খাওয়াবি ?

ও বাড়ি থেকে বেশ ঝাল ঝাল করে সর্ষের তেল দিয়ে রান্না করিয়ে নিয়ে যায় শেফ কে দিয়ে। ওদের চারটে শেফ। একজন ওড়িয়া। ওর নাম সরোজ। সেই রান্না করে দেয়।
ববিদি খেলো না। সেদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই ও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সাচ্চুলাল ফিরে এসেছিলো তার মাসকয়েক পরেই। এমনিই। মায়ের খবর কিছু জানতো না। ড্রাগস নেওয়া বন্ধ করিয়েছে ওর বাবা , চিকিৎসা করিয়ে করিয়ে। এখন ও কাজ করে একটি আই টি ফার্মে। ডেটা এন্ট্রি করে। আর এক ফিজিওথেরাপিস্ট ওকে বিয়ে করেছে , প্রেম করে। মেয়েটি মহারাষ্ট্রের লোক। শ্রমণা দেশমুখ নাম তার। স্লাটকে ভুলে গেছে।
বাবার সাথে সাচ্চুলালের এখন ভালই যোগাযোগ আছে। বাবা ওর মাকে অবহেলা করলেও ছেলেকে দেখতেন। স্নেহ করতেন। ববিদি এই অবহেলা সহ্য করতে না পেরে ঐ রাজস্থানি ছেলেটির সাথে জড়িয়ে পড়ে। আজ সাচ্চুলাল আপাতদৃষ্টিতে সুখি। ববিদি আর কটাদিন যদি বাঁচতো তাহলে হয়ত সুস্থ হবার একটা সুযোগ পেতো ! গাছকে নিজের মর্মবেদনা জানালো মৈথিলী।

অন্ডাল দক্ষিনীদের মাঝে মহিলা সেন্ট রূপে পূজিতা। উনি বৈষ্ণব ধারার সেন্ট। তুলসী গাছের নিচে ওকে পান ওর পিতা আরেক বৈষ্ণব। উনি বিষ্ণুকে বিবাহ করেন। মনে প্রাণে। আর একমাত্র মহিলা প্রখ্যাত বৈষ্ণবী। যার নামাবলী ও তুলসীকাঠের মালা শুধুই বিষ্ণুর জন্যে জেগে আছে। বিষ্ণুর অন্য অবতার হয়গ্রীবা বা হয়শীর। শ্বেতপদ্মের ওপরে বসে জ্ঞানসিন্ধু এই দেবতা অন্ধকার ও অজ্ঞতার ওড়না সরিয়ে জ্ঞানসাগরে সবাইকে ডুব দিতে সাহায্য করছেন। ওঁর মস্তক অশ্বের মতন - দেহ মানবের ন্যায়। স্ফটিকের মতন উজ্জ্বল এই অবতার সদা ব্যস্ত তাঁর জ্ঞানালোকে এই তমসাচ্ছন্ন ধরিত্রী শুদ্ধিকরণে - বলতেন নাটু মামা। নটবর দে। বিরাট ওষুধ ব্যবসায়ী। ওদের ক্লাবের একজন হর্তাকর্তা। একটি ছেলেকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে ব্যবসায় বসিয়ে ছিলেন। নাম রঘু। রঘু গান্ধী। কলকাতায় বহু পুরুষের বাস , হাফ বাঙালী। ছেলেটির বাবা একটি দোকান চালাতেন। সেখানে ধার দেনা করে মদে ডুবে হারিয়ে যান। মা এই কষ্ট সইতে না পেরে উন্মাদ হয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকেন।
বলতেন ওর নাম অ্যানি আন্টি , কোনো স্কুলে পড়ান।

- আমার নাম অ্যানি আন্টি , আমাকে একটি পেনি দেবে ? ডলার , পাউন্ড ? আমি টাকা পয়সা মানি নিই না। আমি ফরেন থেকে এসেছি কিনা।

এই ছিলো ওনার স্ট্যান্ডার্ড ডায়লগ। শেষকালে ফুটপাথে শুয়ে থাকতেন। তখনকার দিনে মানুষ এত অসভ্য ছিলো না। সভ্যতা তখনও ছিলো। দয়ামায়া। তাই হয়ত দোকানিরা ওকে খাবার ছুঁড়ে দিতেন। আর কেউ যুবতী , সুন্দরী পাগলিনীকে রেপ করেও দেয়নি। একা পেয়ে। তাই উনি বেঁচে যান। অবশেষে নাটু মামার কল্যাণে উনি এক উন্মাদশ্রামে ঠাঁই পান। সেখানে দেহ রাখেন। সেই রঘু গান্ধীকে নাটু মামাই হাতে ধরে বড় করেন। ব্যবসায় দীক্ষিত করেন। নিজের সুবিশাল কারবারের অংশীদার করেন। নিজের পরিবারে একজন করেন। নাটুমামার কোনো ছেলেপুলে নেই। যৌথ পরিবার। ভাগ্নে ভাগনি ও এক বিধবা দিদি সব দেখা শোনা করেন , আর চাকর বাকর। স্ত্রী ছিলেন। উনি খুবই রূপসী। যৌবন ঢলে পড়তো। খোলামেলা সাজ পোশাক। নাটুমামা একটি পাঁচতারার বারে নিয়মিত যেতেন। সেখানকার এক কর্মীর সাথে একদিন ওর স্ত্রী পলায়ন করেন। নাটুমামা আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। যদিও পরিবারের সকলে বহুবার তা বলেছেন ও অনেক সুন্দরী মেয়েদের পিতামাতারা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। রঘুকেই পুত্র স্নেহে গড়ে তোলেন। বড় চালাক ছেলে। নিজ ভাগ্নে শ্যামল কর্মঠ কিন্তু ব্যবসায়িক বুদ্ধি তত পাকা নয়। ও একটু ভালোমানুষ গোছের। --- ও টিপিক্যাল ভেতো বাঙালী -- বলতেন নাটুমামা। বলতেন , কবিগুরু এদের সম্পর্কেই লিখে গেছেন: রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি !

কবিগুরু তো শ্যামলকে দেখেন নি ! তাহলে , দ্যাটস্ হোয়াই হি ওয়াজ আ জিনিয়াস। বলে দিলখোলা হেসে উঠতেন।

বড় ভালোমানুষ ছিলেন নাটুমামা। মৈথিলী ও যোগিনীকে খুব স্নেহ করতেন।

সেই মামাকে ঠকিয়ে নিলো শেষসময়ে ঐ রঘু ও তার বৌ ইরা চৌহান গান্ধী।

সব সইসাবুদ করিয়ে পথে বসালো শ্যামলের পরিবারকে। এখন শ্যামল থাকে দুই কামরার এক ফ্ল্যাটে। কাজ করে পাড়ায় , একটি ফার্মাসিতে। ওর বৃদ্ধা মা , তার দুই পা ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত। সেই মাসিমা বড় স্নেহশীলা মানুষ। মৈথিলীর ওঁকে খুব ভালোলাগতো। কয়েকবার ওদের বাসায় রামঠাকুরের উৎসবে দেখেছিলো। খুব ডিগনিফায়েড মহিলা আবার নরম সরম। উনি এখন ছেঁড়া শাড়ি পরেন। কথা বলেন না।

চোখ দিয়ে শুধু জল গড়ায়। একটা কথাই বলেন : আমি জীবনে কোনো অন্যায় , কারো ক্ষতি করিনি , রঘুকে নিজের ছেলে ভাবতাম।

নাটুমামার মার্সিডিজ , হন্ডা অ্যাকর্ড , প্যাজেরো সব দামী গাড়িগুলো নিয়ে গেছে রঘু। কিছুই নেই। সব নাকি ওর নামে মামা করে দিয়ে গেছেন।

এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে মাসিকে , শ্যামল ও তার পরিবারকে এবং ওদের এক ডাইভোর্সি বোন আছে রূপছায়া নামে তাকে। তার প্রাক্তন স্বামী আমেরিকায় বিরাট উকিল। খুব নাম আছে ক্রিমিন্যাল ল -তে। উনি বলেছিলেন ওদের কেস করতে। কিন্তু বাড়ির মেয়ে রূপছায়া ও বৌ মানে শ্যামলের স্ত্রী অনিন্দিতাকে মাসি কোর্টে, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেবেন না তাই কেস করা হয়নি।

রূপছায়ার স্বামীর সাথে ওর এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও ওরা এখন বন্ধু। ডাইভোর্স হয়েছে কারণ মেয়েটি আমেরিকার সমাজে মানাতে পারছিলো না। ও ভারতীয় নারী , আদর্শ। আর ওর স্বামী এখানে আসবেন না। ওখানে সে সাকসেসফুল এক উকিল। কিন্তু ওরা বন্ধু। চ্যাট করে। মোবাইলে কথা হয়। পরস্পরের শুভাকাঙ্খী।

এদের সবার দু:খই মৈথিলীর খুব কাছের বস্তু। এগুলো সবই জানালো ঐ নীরব গাছটিকে। ওর একটি সেতারের বাজনা , সুর -একটি নীরব গাছকে ও উৎসর্গ করেছিলো। সেই বাজনার নাম দিয়েছিলো : সায়লেন্স।

নি:স্তব্ধতাও কথা বলে। দক্ষিণামূর্তি নামক শিবের একটি ফর্ম আছে। কমবয়সী একটি ছেলে , বয়স্ক ব্রাহ্মণ সাধকদের সাধনার পাঠ দিচ্ছেন। এই কনসেপ্ট।

সেই দক্ষিণামূর্তি কিন্তু সায়লেন্ট। এও নাটুমামার কাছে শোনা।

উনি এইসব পৌরাণিক গল্প খুব বলতেন। অবসরে পড়তেন।

সেই সায়লেন্স বাজনা শুনে অনেকেই বলেছিলেন যে : সায়লেন্সকে যে সুরে ধরা যায় এই কনসেপ্টটাই খুব ইউনিক। সুন্দর। আর বাজনা তো সুছন্দের ভরা। সুগ্রন্থিত। অনেকে প্রশ্ন করতেন যারা একটু ভাবুক : আচ্ছা আপনি নিজে সুর হতে পারেন ? সুর আঁকতে পারেন ?

মৈথিলী হেসে বলতো : আমার বান্ধবী মোনালিসা সুরকে গড়তে পারে মাটিতে , তন্তু দিয়ে। ও একজন ভাস্কর।

৩৮।

ওর দিদি যোগিনী সবসময় বলতো যে বিজনেস একটি এনটিটি । মানুষের মতন । ওর কনসাশনেস ও সেন্স আছে । ও হাসে , কাঁদে , খুশি হয় । ওর ব্যাথা লাগে । ও সব বুঝতে পারে । কাজেই লোভে পড়ে কেবল লাভ করে গেলে ওর কষ্ট হবে । ওকে সম্মান দিতে হবে । ওর নিজের স্পেস ওকে দিতে হবে , সেখানে ও খেলবে , নাচবে , গাইবে । কারণ এন্ড অফ দা ডে এই কোম্পানিটা আসলে ওরই । প্রফিট অ্যান্ড লস , শেয়ার , শেয়ার হোল্ডার , ডিবেঞ্চার হোল্ডার সবাই ওরই পার্ট । রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস , ডেবট ট্র্যাপ সবই তো ওরই অংশ । আমরা তো সবাই পরদেশী । সবকিছুর বোঝাই তো ওকে বইতে হয় । নাহলে ওর অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয় । একদিন ও মিলে যায় মহাশুন্যে । কাজেই দায়িত্বের সাথে ব্যবসা করো । সোসাল রেসপন্সিবিলিটি অফ বিজনেস দেখো । মানুষের কথা ভেবো । মানুষ শিল্প চালাবে , শিল্প মানুষকে নয় । মানুষের ব্যবহারের জন্য এই জগতে যথেষ্ট দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা বা ইউনিভার্স যাই বলো , গড কথাটিতে আপত্তি থাকলে বলো অনেস্টি ।

অতিরিক্ত ভোগ বা লোভের এর জন্যে নয় । বেশি উৎপাত করে , প্রকৃতিকে নষ্ট করলে একদিন ধবংস অনিবার্য । কেউ রুখতে পারবেন না । কোনো বিজ্ঞান না রাজনীতি নয় । ওগুলো এক একটি টুল । সমাজ চালাবার । তার ওপরে আছে দর্শন । সেই দর্শন মেনে চললে জীবন শুদ্ধ হবে । অযথা বিপদে পড়তে হবেনা । আজ আমরা ফিলোসফি থেকে বহু হস্ত দূরে । তাই এত বিপদ চারিদিকে । ভোগ লালসা আর যৌনতা আমাদের শিরায় শিরায়,

দ্বিচারিতা মজ্জায় মজ্জায় । নিজ স্বার্থ ব্যতীত এক পাও কেউ চলিনা । যদি চলি তার বড়াই করতে ছাড়িনা । কত সমাজসেবা করেছি , মানুষের জন্যে কাজ করেছি তার ঢাক পেটাই । ফেসবুক তো আছেই । প্রতিটি খুঁটিনাটি আপডেট করি । তাহলে সেবাটি করি কখন ?

আমাদের বদলে ফেলতে হবে নিজেদের নাহলে সমূহ বিপদ । কেউ রুখতে পারবেন না । কোনো রাজাগজা , নেতা , ইন্টেলেকচুয়াল কিংবা ডিপ্লোম্যাট নন । পারবেন হয়ত কবিরা যাঁরা আকাশ রাঙাতে জানেন ।

মানুষই পারবেন । নিজেকে আমূল বদলাও । প্রত্যেকে । তবেই এই বিশ্ব সংসার সুন্দর সাজে সাজবে । যা ভুল হয়ে গেছে , হয়ে গেছে । ক্ষমার আলোয় ধুয়ে দাও । পাস্ট ইজ পাস্ট । পাস্টকে আঁকড়ে বাঁচা যায়না ! প্রেজেন্টে বাঁচো । সমাজে রেপিস্ট ও টেররিস্ট একদিনে তৈরি হয়না । নারীরা নিজেদের মার্জিত ভাব বজায় রাখতে ভুলো না । ডিগনিটি মেয়েদের পরম সত্য । পুরুষেরা স্বভাব অ্যাগ্রেসিভ ।

নিজেকে উন্মুক্ত করলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে । ওরা সবাই বুকিশ না । পুঁথি নিয়ে বসে না।

তাই বুঝি মৈথিলীর খুনী রবিনহুড রেড বেলির কথা , লাস্ট ওয়ার্ড শুনে মনে হয়েছিলো যে প্রিজন অফিসারগণ ওকে ফাঁসি দেননি বরং উনিই সমাজরক্ষকদের একপ্রকার ফাঁসি দিয়ে গেলেন শেষের কয়েকটি কথায় মাধ্যমে - আমার আত্মাকে হনন করতে পারবে কি ? বুড্ডা কিন্তু আমাকে ফেলবেন না যদি আমি রিপেন্ট করি । দ্যাটস্ হোয়াই হি ইজ গড অ্যান্ড ইউ আ পুওর সোল , আ ব্লাডি হিউমান বিং । আমাকে ক্ষমা করতে পারো ? আমি কিন্তু তোমাদের ক্ষমা করে গেলাম । বুড্ডা হ্যাজ টট মি ।

যোগিনী সবসময় বিজনেসের রাইট ও রং সাইড দেখতো । সেই কারণে অনেক বড় ডিল ওরা নেয়নি । অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হবে বলে । বরং মোদির পরামর্শে সে বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপার স্যাপারগুলিকে স্ট্রং করে ।

বিজনেস ইন্টেলিজেন্স হল বিজনেসকে চালিয়ে যাবার জন্যে যত রকম সেরিব্রাল উপায় মানুষ ব্যবহার করে সমস্ত । কোথায় ইনভেস্ট করা উচিৎ , কোন বিভাগকে বাড়ানো দরকার , কোনদিকে প্রফিট মার্জিন বাড়ানো যেতে পারে । কখন ম্যানেজমেন্টের সাহায্য নিয়ে ফাইনান্সকে রেগুলেট করতে হবে , ম্যানেজমেন্ট গুরুদের পরামর্শ মেনে কখন কাজ করা উচিৎ -ইত্যাদি । এইসব তাদের কোম্পানিতে আগে খুব একটি ফলো করা হত যে তা নয় । ওর বাবা বি -স্কুল জার্গন ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন না । নিজ মত দিয়ে কাজ করতেন । তাতেই ভালো ব্যবসা দাঁড় করান । উনি ভিসনারি ছিলেন । মূল ব্যবসা ওদের রিয়েল এস্টেটের হলেও এখন নানান দিকে ডাইভার্সিফাই করেছে । বেশির ভাগ কৃতিত্বই ওর বাবার । পরে মোদি এইসব বিজনেস ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আসে । তাতে ব্যবসা আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে । আয়তন বাড়ে , শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ।

ভালই চলে , ভালো হতে থাকে । কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে দিদি যোগিনী ও মোদি কেউই আজ আর জীবিত নেই । কুন্দন সব দেখছে । কিন্তু লোকে বলে ওর সহজ সরল ভাইটি বদলে গেছে । ও কোম্পানিতে অযথা ঝামেলার সৃষ্টি করছে । বেশি মুনাফার লোভে এমন সব নীতি ও নিচ্ছে যার ফলে ধ্বসে পড়ছে দেওয়াল । তন্ত্র কর্পোরেশানের অফিসে আজ কালির ছোপ । চুনকাম করা সাদা দেওয়ালে ।

ওদের অফিসে ঢুকতেই সব বিল্ডিং- এ একটি করে ভয়াল কালীমাতার মূর্তি আছে । লোলজিহ্বা , করাল বদনী , রক্তজবা স্নাত , মুন্ডমালিনী । সব অফিসে একই চিত্র । ঢুকতেই এইসব মূর্তি । সব কটিই ওর বান্ধবী মোনালিসার সুচারু সৃষ্টি । খুব শৈল্পিক । সেই মায়ের মূর্তিতে আজ নাকি রক্তের ছোপ । সবাই আড়ালে বলে । মা আজ সুস্নাতা নন। রক্তে ডোবা । ভয়াল তাঁর আঁখিপট । কড়ি হার ও করোটিতে লাল ছোপ । চোখ ঠিকরে পড়ছে রাগে , জ্যোতি ভয়ানক । যেন ধবংস হয়ে যাবে সব ।

সবাই বলছে আনাচে কানাচ । মাধবী বিতানে অলিও গুঞ্জন করছে একই সুরে ।

কর্পোরেশান তন্ত্রে -আজ মন্ত্র জপ করছে কোনো রুদ্রমূর্তি তান্ত্রিক , যে অদৃশ্য। যার নেশা ধ্বংস। পেশা মানুষের ক্ষতি করা। সেই কাপালিক আড়ালে বসে বসে রিমোট কন্ট্রোলে খেলছে এক অদ্ভুত খেলা। খুনী যার অপর নাম।

কুন্দনের সইটি খুব আজব ছিলো। কৈশোর থেকেই ওকে মৈথিলী বলতো : সইটি শক্তপোক্ত করো। এত বড় বিজনেস ম্যাগনেটের একমাত্র ছেলে তুমি। তোমার একটি সই পর্যন্ত নেই। রোজই সই বদলাও আর যেটা এখন করছো সেটাও কেমন যেন। এমন সই করো যাতে কেউ নকল করতে না পারে। তোমার পেছনে বহু মানুষের শ্যেন দৃষ্টি। ভুলে যেও না। আমরা বড়লোক। আমরা আর পাঁচজনের মতন নই। আমাদের আশেপাশে মানুষ অনেক কিন্তু বেশির ভাগই রঙিন ফানুস। আমাকে কিংবা যোগিনি দিদিকেও বিশ্বাস করতে যেও না। তুমি খুব ইনোসেন্ট। আজকাল এইরকম মানুষের খুব কষ্ট। ক্লুকেড শুধু আঙুল হয়না , মনও হয়।

আজকালকার যুগে সারল্য , বিশ্বাস , আনন্দে অবগাহন এই জিনিসগুলি খুব রেয়ার কমোডিটি। মানুষ খুব জটিল হয়ে গেছে। ক্লুকেড হওয়া তত কঠিন নয় , সরল হওয়া যত। মানুষ অবিশ্বাসী বড়। কিছুই বিশ্বাস করে না আর। সব কনসেপ্ট ছেড়ে শুধু নির্মলে আনন্দে ডুব দেওয়া তাও আর কেউ করেনা। সবাই শুধু মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে। তুমি এখনও ইনোসেন্ট আছো। শুধু সইটা বদলে ফেলো। নিজেকে নয়।

কিন্তু ছেলে বাস্তবে করলো উল্টো। নিজেকে বদলে নিলো। সই নয়।

ওর সইটা খুব অদ্ভুত। দুটি সমান্তরাল লাইনে একটি ক্রস চিহ্ন। ও বলে আমার ইউনিকনেস। এটাই আমার পরিচয়, আমার সৌন্দর্য্য। আমি বদলাতে অক্ষম।

যে কেউ সই জাল করে নিতে পারে। আজকাল অবশ্যই ও ডি এন এ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্টের কথা বলছিলো।

৩৯।

কুন্দন, ওদের কোম্পানিতে ঘুষের একটি অভিনব ব্যবস্থা করেছে। আগে তো এসকর্ট সার্ভিস ছিলো। তবে যোগিনী সেসব তত কাজে লাগাতো না। মোদি ব্যবহার করতো। কুন্দন এখন অন্য ধরণের ঘুষ স্কিম করেছে। ও নাম দিয়েছে : হ্যাপিনেস কার্ড। যেমন কোনো ডিলের জন্যে ও অপরপক্ষের বাড়ির সামনে একটি বি এম ডাবলু চাবি সমেত রেখে দেবে। কাগজ চুপিসারে ট্রান্সফার হয়ে যাবে মালিকের নামে। কিংবা হনলুলুতে দামী হলিডের টিকিট বুক হয়ে যাবে পরিবারের গোটা ২৫ মানুষের নামে হয়ত একমাসের জন্য। ওটা কাজের ওজনের ওপরে নির্ভর করবে। চাঁদের কফিশপে একটি সিট বুক অথবা গোটা জমি কেনা হয়ে যাবে কারো কারো নামে। তা স্যার রিচার্ড ব্র্যানসনের কল্যাণে চন্দ্রে পাড়ি কি আর স্বপ্ন রইবে বেশিদিন ?

কোনো বিরাট ক্রুজের যা খুবই এক্সপেনসিভ ও সবাই যাবার সুযোগ পাননা সেখানকার টিকিট চলে যাবে সি ই ওর নামে। কিংবা কোনো কোনো বড় শহরের যেমন প্যারিস, নিউ ইয়র্ক , ক্যালিফোর্নিয়া ইত্যাদির পশ এলাকায় বিলাস বহুল অ্যাপার্টমেন্টের চাবি। জনশ্রুতি অবশ্য শোনা যায় ঐসব ঘরে লুকানোও ক্যামেরা থাকে যার সাহায্য নিয়ে ছবি তুলে রাখে কতৃপক্ষ ও পরে অপরপক্ষ বেগড়বাই করলে তাকে বিপদে ফেলতে পারে তার ব্যাক্তিগত মূহর্তের ছবি বাজারে বিকানোর কথা বলে। একজন সি এফ ও একবার

এইরকম কোনো কাজের ফিরিস্ত দিয়ে করেন নি। শুধু ভোগ করে এসেছেন। সি এফ ও হলেন চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার। কুন্দন ছবি তুলিয়ে রেখেছিলো।

উনি ওনার মিস্ট্রেসকে নিয়ে ওখানে যান। স্ত্রীকে লুকিয়ে। সেখানে নিজের প্রাইভেট পার্টস ওয়াইনের গেলাসে চুবিয়ে মিস্ট্রেসকে পান করাচ্ছিলেন। সেই ছবি মিডিয়ায় নিয়ে আসে কুন্দন। ভদ্রলোক বিপদে পড়ে যান। মৈথিলী বাড়িতে ওকে জিজ্ঞেস করে। তাতে পূর্বের সেই ইনোসেন্ট ছেলেটি ধরা দেয়না। বরং ধরা পড়ে এক বীভৎস মুখ। যাকে ভৎর্সনা করতে ইচ্ছে হয় মৈথিলীর। ও বলে : বিজনেস ইজ মানি। টাকার জন্যে আমরা সব করতে পারি। খ্যামটা নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে চলবে ? আইটেম সং এর সাথে যে নাচে তার আবার সতীত্বের পাঁচালি শোনা কেন ? নাঙ্গা অউরৎ বোরখা কেনে নাকি ? কোনো ম্যানেজার আমাদের পলিসির বিরুদ্ধে কথা বললে আমরা সেক্স স্ক্যামে তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারি। সমাজে মাথা কাটা যাবে তার। এছাড়া আছে প্রমোশান আটকে দেওয়া। আমাদের নীতি যে মানে না তার এই কোম্পানিতে কোনো গ্রোথ হবেনা। পদলেহন করতে হবে। প্রয়োজনে এসে তোমার পা টিপে দিয়েও যেতে হতে পারে, বলেই মুচকি হেসে ওঠে !

হতবাক হয়ে যায় মৈথিলী। এই শিক্ষা কি দিয়ে গেছেন ওর পূর্বজরা ওদের দুই ভাই বোনকে ? ওর পিতার আদর্শে গড়া সাম্রাজ্য, ওর দিদি যোগিনী যে নাকি সবটুকু ঢেলে কোম্পানিকে একটি মানবের আইডেন্টিটি, সেল্ফ করে তুলেছিলো, রেস্পেক্ট দিতে শিখিয়েছে প্রতিটি কর্মীকে, শেয়ার হোল্ডারকে তার ভাই আজ এই কথা মুখ থেকে উচ্চারণ করছে ?

কে যেন বলেছেন না : ওয়ার্ডস আর টু সলিড !

সত্যি তাই। বেদনা জানাবার ভাষা নেই আর। ওয়ার্ডস্ শুধু সলিডই নয় খুব চিপ। ওয়ার্ডস্ আর ড্যাম চিপ, দে হার্ট। খুব শক্ত ওর কথাগুলি। যেন ভেঙে ফেলতে পারে

এক একটি প্রাচীন কেল্লা। তাই তো ও সায়লেন্স সেতারে বাজায়। মৈথিলীর ওর সঙ্গটা অসহ্য লাগছে। ও পালাতে চাইছে। আস্তে করে হেঁটে রেলিং-টা ধরে।

- তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? আলতো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় কুন্দন।

মৈথি জবাব দেয়না। ঘর থেকে বার হয়ে যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। সামনে বিরাট বাগান। গেট দেখা যায়না। বড় বড় গাছ। তার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো আকাশ। বড়লোকের রাজপ্রাসাদ। আভিজাত্যে মোড়া স্বর্ণ কুটির। ঝালর দেওয়া এক ধরণের বহুমূল্য পর্দা। দামী আসবাবপত্র। গ্যারাজে দামী সব হাল ফ্যাশানের গাড়ি। এই তো একটি বাড়ি। আরো কত আছে ওদের। কত প্রপার্টি।

মোটা গোঁফওয়ালা পাহারাদার। সিকিউরিটি ২৪/৭। নিরাপত্তার বেড়াজাল।

ইন্টারকম। কত কিছু। শিল্পপতির বাড়ি। এখানে অবশ্য একা ও থাকে তাই নিরাপত্তার ঝামেলা অনেক কম। কুন্দন যেখানে আছে ওখানে তো জেল খানার মতন ব্যাপার। পুরো বডি সার্চ করে ঢোকায়। এমনকি ওকেও। মাঝে একদিন ফোন এলো কে নাকি হিউম্যান বোমা হয়ে এসেছে। সেই নিয়ে বিরাট ঝামেলা। সবাইকে প্রায় ন্যাংটো করে যেমন করে বেসন মাখিয়ে বেগুনী ভাজে পাড়ার মোড়ে হারুর দোকানে সেরকমভাবে আপদ মস্তক চটকে চেক করা হল। মানসম্মান আর কিছু রইলো না কারো।

মৈথিলী কোনো এয়ার ক্যারি করেনা। ও কোথাও গিয়ে বলে না , জানান দেয় না যে : ও কে।

তাই ওখানে সাধারণ পোশাকে যায়। শোনে যে লোকেরা বলছে : বড়লোকের ব্যাপার মশাই। শুনেছি সব ছবি তুলে নেয়। দেখুন এসবের নামে নাঙ্গা ছবি তুলে পরে নিজেরা দেখবে আর রঙ্গ তামাশা করবে। ব্লু ফিল্ম বানালেও অবাক হবোনা।

আমি তো দাদা গিন্নীকে মেয়েকে বলে দিয়েছি : বাড়িতে বসে টিউশুনি করো। এসব অফিস ফফিসে কাজ করার দরকার নেই।

কুন্দন আজ শুধুই ওর ছোড়দি ভাইয়ের ক্রন্দন ঝরায়। সৎ ভাই ওকে কোনোদিন ভাবেনি ওরা দুই বোন। আদতে ওদের বাবা তো এই মাকে কোনোদিন বিয়ে করেন নি। তবুও বুকে টেনে নিয়েছিলো ওরা। কিন্তু আজ ও যেই পথে পা বাড়িয়েছে তাতে মনে হয়

সেদিনের সেই ডিসিশানে হয়ত বিরাট ভুল একটা কিছু ছিলো। তাই আজ সর্বনাশের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে সব , এক এক করে। মৈথিলী শুধুই এক দর্শক। নীরব দর্শক। যার কাজ দেখে যাওয়া। আইনত কুন্দন এই ব্যবসার মালিক। মৈথিলী-ও মালিক তবে ও নিজে ব্যবসাপত্রের ব্যাপারে কিছুই বিশেষ বোঝে না। এই ব্যাপারে ও নাটুমামার ভাগ্নে শ্যামলের মতন।

- রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি।

কাজেই নিজে হাল ধরতে গেলে যে সংগ্রামের মুখে পড়বে ও এবং গোলমাল উপস্থিত হবে তার কথা মনে করেই ও শঙ্কিত। নিজে ও নার্ভের দিক থেকে একটু শিথিল হয়ে গেছে কাজেই ঝড়ের মুখে পড়ার সাহসও আর নেই। মনে মনে শুধু বাবা ও দিদির আশীর্বাদ আর ঈশ্বর নামক সেই অদেখা শক্তির করুণা কামনা করে। হলে তাতেই এবার কিছু হবে। একবার যেন মনেও হল : অ্যাক্সিডেন্টে মোদি যদি না মারা যেতো তাহলে হয়ত আজ এই বিড়ম্বনা হতনা তাদের। মোদি ছিলো তুখোড় ম্যানেজার। কুন্দনের এই পরিবর্তনও হতনা। কেউ একজন জীবিত থাকলে মোদিই ----কোম্পানির হিতার্থে আজ সেটাই ভাবছে মৈথিলী। একটু স্বার্থপর হয়ে গেছে ও। নিজের ভাইকে বলিদানের সম্ভাবনাও মনে উঁকি মারছে।

বড্ড অরাজকতা শুরু হয়েছে তন্ত্র কর্পোরেশানে। একের পর এক ভেঙে পড়ছে স্থাপত্য। প্রফিট বাড়ছে। কুন্দন নাকি এও বলছে ও বিদেশে ব্যবসা বাড়াবে। ভেঙে পড়ুক না বিল্ডিং। ওরা দুবাই , মরোক্কো , লন্ডনে চলে যাবে। ইনভেস্ট করবে ওখানে। প্রয়োজন হলে অন্য নামে কোম্পানি খুলবে।

নেশার বস্তু মারিয়ানা , কেটামিনে চলে যাবে। ওগুলো খুব লাভজনক ব্যবসা। পর্ণোসিনেমা আর ভিডিও বানাবে। ঐ ব্যবসাতেও খুব লাভ।

সমাজে যেগুলি ভদ্র আর ইন্টেলেকচুয়ালের মুখোশ পরে বসে থাকে ওগুলোই নাকি বেশি এসব দেখে। কাজেই ব্যবসা বেশ লাভজনক। হু হু করে অর্থ আসবে।

বিজনেস এথিকসের কথায় বলে - ওসব বস্তাপচা যোগিনী কনসেপ্ট। সত্য যুগের।

আর ফিলোসফি কি বলেছে ? সব কুছ মায়া হ্যায় । অল মায়া । কিছুই নেই আসলে । সবই আমাদের চিন্তা দিয়ে তৈরি করা । এই জগৎ , রঙ , রূপ , বর্ণ , গন্ধ । আদতে নাথিংনেস । কিছু এক্রিস্ট করেনা আদৌ । এই ক্রিয়েশান আসলে মায়া । ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যে । মৈথিলী একটু চমকে যায় । কুন্দন তো এত দর্শন কপচাতো না । এখন কথায় কথায় জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি , ইউ জি , রামতীর্থ , গুডজিফ ----

মোদি জীবিত আছে ওর সহোদরের মনে । ভীষণ ভাবে ।

একটু হাসে মৈথি । রেড বেলির কথাটি মনে পড়ে যায় -

আমি মানুষের মনে থেকে যাবো । দেহ যাবে কিন্তু আমার কথা , চিন্তা থেকে যাবে । এইভাবেই মানুষ অমর হয় । আমি ফেমাস না হলেও ইনফেমাস ।

মোদি হয়ত ফেমাস হয়নি কিন্তু কুন্দন ইনফেমাস হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ।

৪০।

বিরাটনগর সবুজের রাজ্য , জায়গাটি বেশ । ধানক্ষেত , নদী , পাখপাখালি । এইসব ছেড়ে চাষাভুষোদের চলে যেতে হবে অন্যত্র । এখানে শিল্প হবে । শ্রমিকেরা কাজ পাবেন । বহু মানুষ ভুখা নাঙ্গা থেকে দুমুঠো খেতে পাবেন এখানে শিল্প হলে । মালিকদের তাই বক্তব্য। কিন্তু লোকাল মানুষ বলেন এতদিনের ভিটেমাটি ছেড়ে তারা যাবেন কোথায় ? তাদের যে অনেক স্মৃতি , কথা , ব্যাথা বেদনা , আলো আঁধারের খেলা এখানে । জন্ম মৃত্যু আশা ভরসা । শুধু অন্য কোনোখানে অন্য কোথাও গিয়ে আরেকটি বাসা বাঁধলেই কি আর শান্তি পাওয়া যাবে ? পিছুটানের কারণে মনে অশান্তি দানা বাঁধবে । ভালোলাগবে না । মনে হবে ফিরে আসি । নতুন জায়গায় মন বসবে না । সকালের সোনা রোদে , উঠোনে বসে মুড়ি নারকোল আর উষ্ণ চায়ের ভাড় হাতে নিয়ে গল্প আবার দুপুরে কাজের শেষে পান্তা কাঁচা লঙ্কা কিংবা বিকেলের শেষ আলোয় বেগুনির ঠোঙা নিয়ে গল্পগুজব । গোকুল দানা , খড়ের গাড়ি , এলোচুলে গ্রামের মেয়েঝিয়েরা এইসব পরিচিত দৃশ্য ফেলে অন্যকোথাও ! ওরা যেতে রাজি নয় । এখানেই ওরা জন্মেছে , এখানেই ওরা মিশে যেতে চায় মাটিতে । গ্রামে ঢুকতেই একটি কবরখানা । সেটা পার হতেই মূল রাস্তা । সেই পথ দিয়ে গেলে সার দিয়ে ঘর । বড় বড় পুকুর । নদী গেছে অন্যপাশ দিয়ে । ধানক্ষেত , গমক্ষেত , সর্ষে ক্ষেত অন্য ফলন সব হয় নানান ক্ষেতে , আম জাম গাছ । কচি টমেটো , লঙ্কা , মূলো , আলু ডাল সব চাষ হয় । বেশ ভালো ফলন ।

অনেকেই বলছেন এই জায়গা বাদ দিয়ে অন্য জায়গা দখল করতে কিন্তু টিসি কোম্পানি শোনার বান্দা নন । ওরা এখানেই গড়বেন শিল্প । কারণ শহর এখান থেকে কাছে । তাছাড়া বিমানবন্দর, শহরের নানান সুবিধা যা ওদের এক্সিকিউটিভেরা নিতে পারবেন তা কাছেই হবে আর অভিজাত হোটেলগুলি কাছেই , ট্রেন স্টেশান , হাইওয়ে ইত্যাদি । এতকিছু অন্যত্র একসাথে পাওয়া মুস্কিল । এই নিয়ে খুব টানাপোড়েন চলছে । সাধারণ মানুষ বিধ্বস্ত , বিমর্ষ । ওরা ভাঙাচোরা কঙ্কালের সার । রুখা সুখা , ঝর্ণার স্পন্দন বোঝেনা ।

চন্ডী মৈত্র এখানে এসেছেন জনি অরফে জয়ন্তবিষ্ণু বসুর সাথে । যে ওদের কোম্পানিতে রূপসী নারী আনে বিনোদনের জন্যে । ওকে কাকু বলে কিন্তু বন্ধুর মতন মেশে । ওরা একটি বাড়িতে উঠেছে । দু -কামড়ার বাড়ি । এটা ওদের টিসি কোম্পানির বাড়ি । একটু বাংলো ধাঁচের । বেশ প্রাচীন ধরণের । লাল ইঁট । উঁচু দরজা । কালো কালো দেওয়াল ভেতরে । সামনে একফালি বারান্দা । ওরা সকালে ও বিকেলে বসে বসে চা ও সিঙারা জিলিপি ইত্যাদি খায় । গ্রামের টাটকা জিনিস সব । নানান গল্প হয় । ওদের রান্নার লোক আছে । একটি বামুন ঠাকুর । নাম কুমুদ । ভালই রান্না করে । খুব যত্ন করে এক একদিন এক একরকম রাঁধে ।

জনি এখানে এসেছে হাওয়া বুঝতে । ওকে পাঠিয়েছে কুন্দন । ও আগের যুগের রাজারা যেমন ছদ্মবেশে আসতো সেরকমভাবে এসেছে লোকের মনের কথা জানতে । ঠিক কি করলে এদের ইন্টেলিজেন্টলি এখান থেকে সরানো যাবে রক্তক্ষয় না করে কারণ কিছু এন জি ও এবং ফরেন মিডিয়া তন্ত্র কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করছে।জনিকে কেউ চেনেনা ।ও নিশাচর ।তন্ত্রের নেগেটিভ দিকের খেলোয়াড় ।তাই ও এসে এখানে তরী ভিড়িয়েছে । সঙ্গে এনেছে চন্ডী মৈত্র কাকুকে । সময় কাটবে আর কাকু তো একা । ওর বন্ধুও বটে । ভালই কাটছে দিন ।

খাওয়া দাওয়া , চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় । কুমুদ রাঁধে খাসা । নির্ভেজাল বাঙালী খানা । জনি অবশ্য সবরকম খাবারই ভালোবাসে । কচি পাঁঠা , কচি মটর শাক , বেগুনের সর্ষে দিয়ে ঝাল , ঝাল ঝাল করে আলুর দম আর পাতলা রুটি , একদিন আবার গরুর মাংসও

খাইয়েছিলো । মুসলিমদের ওদিক থেকে এনেছিলো । ওদের মসজিদ আছে এখানে । সাঁঝে মোম জ্বালে । ওরা বলে : আমাদের ঐ খানার মাংস ।

জনি খেয়েছে । চন্ডী মৈত্র খাননি । উনি সেদিন মাছ খেয়েছেন । তবে কোনো ছুঁৎমার্গ করেন নি । উনি খুবই ওপেন মানুষ । পুরাতন হলেও আধুনিক । তাই জনির ওকে এত ভালোলাগে । এখানে ওরা এসে দেখেছে প্রাণের কী ভীষণ স্পন্দন ! ওদের ইচ্ছে হয়নি এইসব মানুষগুলি সর্বহারা হোক কিন্তু মালিকের হুকুম । মানার জন্যেই আসা । তাকে অবহেলা করার সাধ্য নেই । চন্ডী মৈত্র বলেই দিলেন : আমি যেই দলের হয়েই এখানে আসি না কেন এদের উৎখাত করার কাজকে মন থেকে সমর্থন করি না । মানুষগুলি কোথায় যাবে ? শিকড় উপড়ে ফেলে শুধু গাছ পুঁতে দিলে সেই গাছে ফলফুল পাতা গজাবে আর ?

জনি চুপ করে থাকে ।

এখানে মানুষগুলি বেশ ভালো , সরল । সাদামাটা । ওদের দেখে বাঁচতে ইচ্ছে হয় ।

যেমন তুলসীর মা । মহিলা একা থাকে গ্রামের একেবারে শেষ কোণায় । একটি কাঁচা ঘরে। ওদের কুমুদের বাড়ির কাছে । ওখানে সে দিন কাটায় ঝুড়ি বুনে । খুব যে অর্ডার পায় তা নয় । একা বিধবা মানুষ , কিছু লোক ঝুড়ি কেনে । স্বল্প আয় হয় । কোনো রকমে চলে । কিন্তু গ্রামের অন্যপাশে ছিলেন এক ভদ্রমহিলা । উনি এসেছিলেন শহর থেকে স্কুলে কাজ নিয়ে । অসুস্থ হয়ে পড়েন । ওকে রোজ রান্না করে নিজ হাতে দিয়ে আসতেন এই তুলসীর মা । স্কুলে যেতে অক্ষম বলে অনেকদিন মাইনে পাননি এই মহিলা কিন্তু তুলসীর মা ওকে নিজ সাধ্য মতন খাবার রেঁধে বেড়ে দিয়ে আসতেন । প্রাণের ছোঁয়া ছিলো তাতে । অথবা বকুল মিঁয়া । নাম শুনে নারী মনে হলেও উনি আসলে এক বৃদ্ধ । নিজের ব্লক প্রিন্টের দোকান আছে । একবার অনেক রাতে এক হিন্দু ভদ্রমহিলা স্টেশান থেকে ফিরছিলেন একা পায়ে হেঁটে । তাকে কিছু গুন্ডা উত্যক্ত করতে শুরু করে । সচরাচর এখানে মুসলিম পুরুষেরা হিন্দু মহিলাদের সাথে তত মেশেন না এবং উল্টোটা । কিন্তু বকুল মিঁয়া ওকে এসকর্ট করে নিজ গৃহে নিয়ে গিন্নীর হাতে সঁপে দেন । পরের দিন প্রত্যুষে উনি আবার ফিরে যান ওর নিজ বাড়ি । সুবাতাসের গল্প কে না জানে !

দুটি যমজ ছেলেকে তাদের মা ফেলে দিয়ে যায় নদীর পাড়ে। তারপর আট বছরে এই বিচ্ছু দুই ছেলে গোটা আর্কটেক দম্পতির কোল ঘুরে সুবাতাসের সাথে এখানে আসে। কিছুতেই কোথাও ওরা টিকতে পারছিলো না। সবাই ওদের নিয়ে নাজেহাল। শেষে সুবাতাস ওদের নিজ গৃহে ঠাঁই দিলো। কাজ করে কি সে ?

একটি পান বিড়ির দোকান চালায়। একটি পেট কোনোক্রমে চলে। তায় আরো দুজন। তবুও ওরা ভালো আছে। সুবাতাস ওদের দু:খ দেখে ওদের চুরি করে নিয়ে এসেছে। ছেলেধরা। ওরা এখানে এসে হঠাৎ যেন মানুষ থেকে ময়ূর হয়ে গেছে। রোজ সকালে ময়ূর হয়ে যায় আর দুপুরে বলাকা। সুদুর নীহারিকায় উড়ে বেড়ায়।

রাতে পানের দোকান বন্ধ করে ঘরে যায় সুবাতাস তারপর বলাকারা ঘরে ফেরে।

ময়না বলে একটি মেয়ে ছিলো যে প্রাণ খুলে গান গাইতো। ওদের বাংলোতে আসতো। কুমুদকে কাকা বলতো। ও গরু চরায়। ফেরার সময় আসতো। সরল মেয়েটি। লাল ফিতে বাঁধা। লম্বা বিনুনি। খালি হাসে। হাতে টিফিন কৌটো।

চন্ডী মৈত্র একদিন জানতে চাইলেন : তোর ঐ ডিব্বায় কী আছে রে ?

ময়না হেসে কয় : পান্তা গো বাবু।

চন্ডী বলেন : আমাকে এক গাল পান্তা দিবি না ও মেয়ে !

- কৌটো খুলে এক খাবলা নিয়ে বাড়িয়ে দেয়। একটি প্লাস্টিকের চামচ জোগাড় করেছে কোথা থেকে। চন্ডী মৈত্র ভেতর থেকে প্লেট নিয়ে আসেন। ভালো করে মেখে এনেছে। সর্ষের তেল, পেঁয়াজ , লংকা , নুন, টমেটো দিয়ে। ভালো লাগছে খেতে। জনিকে জিজ্ঞেস করলেন উনি : খাবে ?

জনি কপালে আলতো ভাঁজ ফেলে কিছুক্ষণ কী ভাবে। তারপর বলে : নাহ্ থাক।

সেদিন বিকেলে ওরা হেঁটে যাচ্ছিলেন সবুজ প্রান্তর বরাবর। ভাবছিলো জনি যে এইসব সবুজ ক্ষেতে উঠবে উঁচু উঁচু মহল। হাই রাইজ। স্কাই লাইন বদলে যাবে। নির্মল বাতাস স্পর্শ করবে পেট্রলের তীব্রতা। মানুষ মেশিনে রূপান্তরিত হবে। মানুষের গা থেকে পেট্রলের গন্ধ বার হবে। এইসব সরল সাদাসিধে ময়না , বকুল মিঁয়া , কুমুদের জায়গায় আসবে প্রিটি , কেটি , টানিয়া , ম্যাড্স-রা। হবে নাইট ক্লাব। বসবে সুরার আসর।

রঙীন পাত্রে বইবে নানাবিধ ওয়াইনের ফল্গুধারা। হারিয়ে যাবে এক একটি গোটা সরল প্রজন্ম। যারা নির্মলতায় বাঁচে। কিন্তু উপায় কি ? আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে -এইভাবে এগিয়ে চলে সভ্যতা। একদিন তো এখানে ছিলো জঙ্গল , আদিমতা , বুনো মানুষের হুংকার। আজ ওরা কথা কয় , এসেছে লিপি , হরফ , শিল্প , ভাস্কর্য , চাকা --- চাকা ---যা সভ্যতার মূল গড়ে দিয়েছে। চাকাই সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।তারপর লোহালক্কর। আকরিক , খনিজ। এইভাবেই ভেসে চলে মানবজাতির ইতিহাস। তাই এই সবুজকে একদিন না একদিন হারাতেই হবে কোনো না কোনো চাকার তলায়। আজ নাহলে কাল। কালের চাকায় পিষ্ট হবে এই সবুজ বন ও মন। ঘাস ফুল হবে ফাটা এক চুমকির মতন --বিষাদ নুড়ি , কষ্টরেখা।

কবি রেখা রায় লিখেছিলেন :

ছুটেছে কালের রথ , ছেড়ে দিতে হবে পথ
নতুন তরঙ্গ আসে যায় !

সুরার কথায় মনে পড়ে জনির , ও শিখেছিলো রেসপন্সিবেল সার্ভিং অফ অ্যালকোহল। বার ও পাবে কিভাবে দায়িত্ব নিয়ে বিয়ার ও মদ সার্ভ করতে হয় তাই ও শিখেছিলো হসপিটালিটি কোর্সে। কেউ অতিরিক্ত পান করে মদ্যপ হবার আগেই কখন মদ সার্ভ করা বন্ধ করতে হবে , পোলাইটলি বলতে হবে ক্লায়েন্টকে যে আর পান করোনা। ওরা পান করার পরে গালি দিতে পারে এটাই নেচার হিউম্যানদের কাজেই কমপ্যাশনেটলি ওদের ট্রিট করা দরকার। ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ওদের কথা গায়ে মাখলে চলবে না। পাল্টা গালিও নয় , তালিও না।
যখন দেখবে বেশি পান করে ফেলে বিপত্তি ঘটতে পারে তখন অন্য ড্রিঙ্ক ও খানা সার্ভ করতে হবে কায়দা করে কারণ পয়সা ওকেই দিতে হবে তাই ওকে আগে কনভিন্স করতে হবে যে এগুলো খাও। সেটাও কায়দা করে। তারপরে কেউ যদি কমবয়সী বাচ্চাকে নিয়ে এসে মদ্যপান করাতে উদ্যত হয় তাকে বাঁচানোর জন্যে আইনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এগুলো সমস্ত ও শিখেছিলো। যেহেতু মদ সার্ভ করার সাথে সাথে লিগ্যাল ও জুডিশিয়ারি জড়িয়ে , মদ্যপ অবস্থায় অনেক কেস হয় - মারদাঙ্গা , তাই

ওদের এগুলো খুব রেসপন্সিবেল ভাবে হ্যান্ডেল করতে শিখিয়েছিলো । সাধারণ মানুষ এগুলি জানেনা , ওরা ভাবে সবাই মদ্যপ হয়ে মারামারি করে আর বার গার্ল ও বয় কিছুই করেনা বা জানেনা কি করে সিচুয়েশান ট্যাকেল করতে হয় । আসলে মানুষ সবকিছুরই ব্যবস্থা করে রেখেছে । মানুষই গড়ে আবার ওরাই ভাঙে । ভাঙা আর গড়া এই নিয়েই তো জগৎ । সাগর কিনারে জগতের সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ মেলে । বালির স্তুপ দিয়ে তৈরি কোনো স্থাপত্য - ঢেউ এসে ভাঙে আবার কোনো শিশু গড়ে কোনো ভাস্কর্য । আবার ঢেউ ভেঙে দেয় । আবার গড়া হয় নির্মল মনে ও হস্তে । এই তো জীবন । সবাই জানে এ স্থায়ী নয় । সমুদ্র মন্থনে এই মূর্তি ভাঙবেই । তবুও গড়ার আনন্দেই গড়ে ওঠে ।

এই গ্রামে হঠাৎ-ই শয়ে শয়ে মানুষ মরতে আরম্ভ করলো । প্রায় সবাই মারা যাচ্ছে মস্তিষ্কের ব্যামোতে । ব্রেন ফিভার যাকে বলে । মেনিনজাইটিস, এনসেফেলাইটিস ।
এইসব হঠাৎই মানুষের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো । দু একজনের শুরু হতেই জনিরা চলে গেলো শহরে । কিছুদিন পরেই তা মহামারির আকার নিলো । কঠিন ব্যাধি ।
প্রচুর মানুষ মারা যেতে মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়লো । হঠাৎ কোনো মশার কামড়ে এটা হচ্ছে কিনা সেই নিয়ে সন্দেহ বাড়লো । কিন্তু সেই ধরণের কোনো বিশেষ মশার উৎপাত বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করতে অক্ষম । এদিকে শহরে এই নিয়ে তোলপাড় । টিসি কোম্পানির অফিসে শোরগোল । রোগ ছড়াতে পারে । জনে জনে । তাই ।
ওদের নেক্সট প্রোজেক্ট এখানে এবং খুব প্রফিট হবে এখান থেকে ।
তবে ক্রমাগত লোক মারা যাচ্ছে তাতে কুন্দন বললো যে : আপনা আপনি গ্রাম দেখছি খালি হয়ে যাবে ! গড ইজ গ্রেট ।
এরকম একটি উক্তি করাটা কতটা ইন হিউম্যান তা বুঝলো জনি যে ঐসব মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছে । ময়না , বকুল মিঁয়া, কুমুদ । ওরা সব অতীত।
মুখে কিছু বলেনি । হৃদয় রক্তাক্ত হয়েছে । দরিদ্র মানুষের আর থাকে কে ?

বিরাটনগর বেশ গরম জায়গা । এখানকার লোকে আদা রসুন দিয়ে রান্না করে বেশি । শুকনো লঙ্কা কম ;কাঁচা লঙ্কা বেশি খায় । স্বাস্থ্য ভালই তাদের । প্রচুর খাটে । খোলামন । উদার । সরল সাদাসিধে । ভালোমানুষ ।

তাদের এহেন কালব্যাধিতে অস্বাভাবিক মৃত্যু খুবই দু:খের। সেরকম কোনো জীবানু মেলেনি। একের পর এক লোক মরেছে। শুন্য ঘর বাড়ি উঠোন দালান। গরুগুলো চেয়ে আছে হাঁ করে। জাবনা কাটছে একমনে। মালিক মরে গেছে। থেকে থেকে বলহরি হরি বোল এই রোল সারা গ্রাম জুড়ে। কে কখন যাবে কেউ জানে না ! সেই পুরাতন কালের ম্যালেরিয়া বা কলেরার মতন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান থেকে মেডিক্যাল অফিসার এসেছেন জনাকতক। তাঁরা নানান ভাবে পরীক্ষা করে বার করেছেন যে একপ্রকার দুর্লভ অ্যামিবার জন্যে এই দুর্ঘটনা ঘটছে। এই গ্রামে প্রায় ৪০০ মানুষ। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৫০ জন মারা গেছে। কিছু হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন। ওরা দেখেছেন যে পুকুরের জলে স্নান করাতে এই বিপত্তি ঘটেছে। নাক দিয়ে জল ঢুকে এই কান্ড ঘটাচ্ছে। যারা ডুব দিয়ে স্নান করেন তাদের মধ্যেই এই সমস্যা হচ্ছে। ল্যাবে স্যাম্পেল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে দুটি মূল পুকুরের জলে এই মারণ অ্যামিবা পাওয়া গেছে। এই অ্যামিবা বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। কয়েক কোটি হয়ে গেছে হয়ত ইতিমধ্যেই। কিন্তু এই জীবাণু এলো কোথা থেকে ? সবার কপালে ভাঁজ ! আগে তো এরকম কিছু থাকবেই না তাহলে এত মানুষ আজও জীবিত আছে কি করে ? পুকুরের জল তো স্ট্যাগন্যান্ট। তবে ? আমদানি হল কী রূপে ??

৪১।

তন্ত্র রুদ্রানী কর্পোরেশানের অফিসে রাকা রয়ের সামনে বসে জনি। রাকা আজ পরেছে লাল ড্রেস। মার্জিত ওর সাজ , আজকে। পরিবেশ খুব গম্ভীর। কথা শুরু করে জনি। বলে : কোম্পানির কিছু দামী শেয়ার মিস্টার চৌহানকে না দিয়ে মিস্টার গ্রেসি ন্যাগোকে যেদিন দিলো কুন্দন সেদিন আমার প্রথম সন্দেহ হয়। যোগিনী দিদি কিংবা ওদের পরিবারের কেউ কোনোদিন এরকম করবেন না তিনি যতই বদলে যান। কারণ গ্রেসি ন্যাগো ওদের জাত শত্রু শুধু আজ নয় ওদের বাবার সময় থেকে। অত্যন্ত বাজে ভাবে ওঁকে অপদস্থ করেছিলেন উনি। ওরা কখনই , কোনো অবস্থাতেই ওকে এতগুলো শেয়ার দেবে না। তারপর যখন এই অ্যামিবার আক্রমণ হল , আমি তো তখন ওখানেই ছিলাম। বেশ তো ছিলো সব। একদিন রাতে পূর্ণিমার সময় আমি একা হেঁটে যাচ্ছিলাম গ্রামের পথে। দেখি পুকুরের জলে দুজন মানুষ কিছু ঢালছে। শহরের লোক বলেই মনে হল। তখন বুঝিনি। আজ ক্লিয়ার সব। পরে ঐ অসুখ ছড়িয়ে পড়ায় আমার ঐ ঘটনা খেয়াল হয়।

লোকগুলির পরণে ছিলো গলা অবধি বন্ধ হওয়া এক আজব কোট আর পুরো কালো পোশাক ও জুতো। মাথায় স্পাইডার ম্যানের মতন টুপি। টাইট ধরণের।

হয়ত ওরাই নানান পুকুরে ওগুলি মিলিয়েছে। রাজস্থানের দিক থেকে নাকি এনেছে , রিপোর্ট বলছে। ওদিকে কোনো জনমানবশুন্য জলাশয়ে এই রেয়ার অ্যামিবা মেলে।

খুবই রেয়ার। যা মানুষের ব্রেন খেয়ে নেয়। কিছু দিন আগেই আমি আন্তর্জালে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট পড়েছিলাম ইয়াহু নিউজে।

রাকা মৃদু হাসে। বলে : ও আমাকে বলেছিলো যে চৌহান গল্ফে ভালো না। খালি হারে - ওর কাছে। তাই ও গ্রেসি ন্যাগোকে শেয়ার দিয়েছে। হাই লেভেলে নাকি এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কে কাকে বেশি খুশ করতে পারে। ও ন্যাগোর সাথে গল্ফ খেলে বেশি খুশি। আর ন্যাগো তো সুন্দর সুন্দর জায়গা ঘোরায় ওকে গল্ফের নাম্নে। দারুণ সব গল্ফকোর্স আছে বিশ্বে। সেসব দেখায়। চৌহান খুব গ্রস খেলোয়াড়। ওকে আনন্দ দিতে পারেনা। তাই ন্যাগো পেয়েছেন। এগুলো আসলে ফাইনার টাচের ব্যাপার। বলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে রাকা।

কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ও আমেরিকা ঘুরে এসেছে। যদিও ও মিলিত হয়েছে কুন্দন রূপী মোদির সাথে বেশ কয়েকবার। সো হোয়াট ? ইট্স্ আ পার্ট অফ দা গেম। ও কিছু মাইন্ড করেনা। ও খুব লিবারাল।
স্টেম সেল থেরাপির এক নবদিকের সাহায্য নিয়ে মোদি আজ কুন্দন। গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত কুন্দন। বেঁচে যায় মোদি। হাসপাতালে জানতে পারে এই নতুন থেরাপির কথা এক চিকিৎসকের কাছে। এটা এখনও বাজারে আসেনি। ওরা রুগী খুঁজছেন যারা নিজেদের দেহ ভাড়া দেবেন পরীক্ষার জন্যে। নতুন লিম্ব বা পা, হাত গড়ে উঠবে এই চিকিৎসায়। যেমন নখ এর বৃদ্ধি কখনো বন্ধ হয়না। ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। সেরকম হাত ও পা এবং হাড়ও একই লজিকে গড়ে তোলা যায়। নখের তলায় আছে এই চমকপ্রদ কোষ যা বেড়ে উঠে গড়ে তুলবে হারানো পা কিংবা হাত। নবজীবন পাবেন খঞ্জ মানুষ , হবেন পূর্ণ। মোদির হারানো পা গড়ে উঠলো এই চিকিৎসায়। সময় লাগলো। তাই তো অনেক দিন ছিলো আমেরিকায়। তন্ত্র কোম্পানি জানলো মারা গেছে মোদি বেঁচে আছে কুন্দন। জানালো মোদিই, প্রেস রিলিজে। সেই তো ওদের ম্যান ফ্রাইডে ছিলো যোগিনীর পরে। সে-ই সব স্থির করতো কোম্পানির পলিসি। কারণ আইনত এখন কুন্দনই মালিক। কাজেই ওর স্থানটি দখল করে নিলেই কেল্লা ফতে। সব এসে যাবে হাতের মুঠোতে।

নাহলে মোদি হয়ে ফিরে গেলে শুধু ম্যানেজার হয়ে থাকতে হবে। সব সম্পত্তি চলে যাবে মৈথিলীর নামে। ও হয়ত বিক্রি করে দেবে।

এই কোম্পানি অনেকটাই মোদি গড়েছে নিজের বুদ্ধি ও ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা দিয়ে যদিও যোগিনী ছিলো সৎ কর্মী। এই সুযোগ। মৈথিলী নিজ স্বপ্নের জগতেই ডুবে থাকে -আস্তে আস্তে সব নিজের নামে হয়ে যাবে !

মুখটা বদলে নেওয়া আজকাল কোনো বিগ ডিল নয় কসমেটিক সার্জারির কল্যাণে।

ওর মুখের স্কালটা কিছুটা কুন্দনের মতন ছিলো এই যা সুবিধা। প্রকৃতি খুবই খেয়ালি তাই তো দেখছে বরাবর। নাহলে কোথার থেকে আজ কোথায় ! ভেবেছিলো সাধু হবে , সব কুছ মায়া হ্যায় ---- নাথিং নেস আর আজকে ---সামনে ঐশ্বর্যের ইউনিকনেস। স্টেম সেল থেরাপি , কসমেটিক সার্জারি , ঘাতক অ্যামিবা , আকাশচুম্বি উচ্চাশা , নাথিংনেস , জিড্ডু কৃষ্ণ মূর্তি ----

সব কেমন ধোঁয়ার মতন দূরে মিশে যাচ্ছে। মাথাটা কাজ করছে না আর। বড্ড ক্লাউড জমা হচ্ছে আজ মস্তিষ্কের চারপাশে।

সোফা থেকে উঠে বড় কাচের জানালার দিকে এগিয়ে যায় জনি। জয়ন্ত বিষ্ণু। আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আজ এক পিম্প।

নিচে ট্রাফিকের সারি। কুন্দন যে আদতে মোদি তা এখনও কেউ জানেনা।

ওরা কাউকে বলেনি। বলবেও না। এগুলি পুলিশের কাজ। তদন্ত হলে হবে। ওদের আর কি ? ওরা তো কতগুলি লুডোর ছক্কা। দাবার ঘুঁটি।

রাকা বলে ওঠে : আজ আকাশটি বড় বিষণ্ন তাই না ?

কেমন দম বন্ধ হয়ে আছে। কোথাও যেন একটুও বাতাস নেই।

বড় মন খারাপ করা কবিতার মতন। একছত্র নিরাশা। বিমূর্ত অলৌকিকতা।

অবিশ্বাসের বেড়াজালে ঘেরা মৌন মুখরতা।

রাকা আবার বলে ওঠে : ও আমাকে একটি মাঝারি সাইজ বটল দেখিয়ে একদিন মজা করে বলেছিলো যে এতে বিষ আছে। এই বিষ দিয়ে ধবংস করে দেওয়া যায় পুরো একটি

রাজ্য। আমি ভাবি মজা করছে - কিছু সত্যি নয়। কিন্তু তখন জানতাম না যে ওতেই হয়ত ঐ জীবানু রয়েছে ! যা দিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে পুরো বিরাটনগর গ্রাম।

জনি নীরব। ওর চেনা মানুষগুলির অনেকেই আজ হারিয়ে গেছে অমৃতের মাঝে। কারণ ওরা দরিদ্র হলেও উচ্চস্তরের মানবসন্তান। ওদের বাস অমৃতকুম্ভেই। নাথিংনেস থেকে যারা আসে তারা সেখানেই ফিরে যায়। মহাশুন্যতা ! তারা সর্বহারাই হয়। তারা কিছু আনেও না -নিয়েও যায়না। কারণ মহাশুন্যতায় কিছুই নিয়ে যাওয়া যায়না , ব্ল্যাকহোল সব গ্রাস করে নেয়।

তাই তারা বচন বাগীশ মোদির মতন লালসার শিকার নয়।

তাদের কেউ কেউ আবার নিজেদের স্পেশাল সোল বলে দাবীও করেনা।

অনেক শহরে আধুনিকাকে জনি বলতে শুনেছে : আমাকে পাইলট বাবা , ক্লাববাবা, পাউভাজি বাবা অমুক বাবা তমুক বাবা বলেছেন : আই অ্যাম আ ভেরি ভেরি স্পেশাল সোল - অথচ তাদের মধ্যে নম্রতা নেই , সরলতা নেই , স্নিগ্ধতা নেই। আলো নেই , জোছনা নেই।

বিরাটনগরের বাসিন্দারা হয়ত গরীব , গেঁয়ো সুন্দরী কিন্তু ওদের মধ্যে প্রাণের পরশ আছে। তাই ওরা অমৃতের মাঝে মিলিয়ে যেতে পারে। মগজে অ্যামিবা আঘাত করলেও। মৃত্যু সবসময়ই বেদনার। দু:খের। তবুও অসংখ্য তারার মাঝে ওরা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। তারারাও ওদের রক্ষা করে জন্মলগ্ন থেকেই। সবার অলক্ষ্যে।

কৈশোরে একটি কবিতা পড়েছিলো। আজ ওর জীবন থেকে সারল্য হারিয়ে গেছে তাই ফুলের স্পর্শ বেশ লাগে।

বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কৈ ?

ওর যেন মনে হয় প্রশ্ন করে : মাগো আমার শোলক বলা কুমুদ দাদা কৈ , বকুল মিঁয়া কৈ ? সবাই হারিয়ে গেছে অ্যামিবার নিঠুর অস্ত্রাঘাতে।

লিফটে করে নিচে নেমে আসে। পাশের কাফেতে ঢুকে খালি টেবিল দেখে বসে। পাইপ ধরায়। আনমনে কিছু ভাবে। তারপর চোখ বন্ধ করে ঢোলে পড়ে এক অজানা দেশে যেখান থেকে কখন ফিরবে কেউ জানেনা। দূরের আকাশে নীল , আকাশি , লাল , বেগুনি হরেক রংয়ের খেলা। সূর্য অস্ত গিয়েছে। বাতাসে হিমের রেশ। আরেকটি দিন শেষ হল কালের ক্যালেন্ডারে। টাইম ও স্পেসে এবার হবে আবার নব সংযোজন ।। মোদি বলতো : আমরা টাইম অ্যান্ড স্পেসে লিমিটেড। যদি এই দুই ডায়মেনশান ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারি দেখবে অনন্তে মিশে গেছি।

চেতনার চৈতন্য হলে সময় হারিয়ে যায় !

এত ফিলোসফিক্যাল মানুষ যে -সে নিজে কর্মের ক্ষেত্রে এত নেগেটিভ ?
মনুষ্য চরিত্র সত্যি রহস্যময়। আগাথা ক্রিস্টির নভেল কিংবা শার্লক হোমসের গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। তবে জনি ক্ষমা করতে জানে। ও সবকিছু ইউনিভার্সকে দিয়ে দেয়। ইটার্নিটি বিচার কর্তা। মোদিই শিখিয়েছিলো। সেই আদি ও অকৃত্রিম মোদি। এতে নাকি মন হাল্কা থাকে। অযথা চাপের সৃষ্টি হয়না।

- সবকিছু ইউনিভার্সকে দিয়ে দেবে। ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। কি নিয়ে এসেছো যে নিয়ে যাবে ?

কে যেন বলেছিলো কিছু কিছু মহামানবের কথা ফলো করবে , কাজ নয়। এও সেরকম মনে হয়। মহাবিশ্বেও হয়ত এর চেয়ে অনেক কম রহস্য আছে। মন রহস্যই সেরা।
মোদি , মৈথিলী দিদি , যোগিনী দিদি , রাকা সবাই ভিন্ন। কুমুদ , চন্ডী কাকু। অথচ সবাই মানুষ। আবার নেপালে সোফিয়া পেখম ও হেমরাজ লামা আছেন ওরা অন্যধরণের। ওর স্বামী অন্য জাতের মানুষ। পতিতাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ করেন। সম্মান দেন। ওদের সন্তান তামিল বোঝে সেও খুব অদ্ভুত , মানুষের *উইয়ার্ড বাচ্চা*। জনির চোখ বুজে গেছে। মন এক গহীন নীরবতায় ভরে যায়। সেই অনুভূতির কোনো নাগাল পাওয়া যায়না। ওর মনে হচ্ছে ও এক বিমূর্ত সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। ওর আশেপাশের মানুষজন , চেয়ার টেবিল , কফির পেয়ালা , শো পিস হারিয়ে যাচ্ছে ওর অন্তরে। ও নিজে ডুবে যাচ্ছে ইনফাইনাইটে। সুপ্রিম কনশাসনেসে। চারিদিকে এক অদ্ভুত নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলছে না।

প্রকৃতি উন্মাদের মতন আজ সায়লেন্স বাজাচ্ছে । দিগন্তে কেবল সায়লেন্সের মূর্চ্ছনা ।
সুরগুলি রামধনু ।

দিকচক্রবাল চিরদিনই রহস্যাবৃত ।
ধ্বনি ডুবে যাচ্ছে , ডুবেই যাচ্ছে , মাল্টি ডায়মেনশনে - ক্রমাগত ।

= =

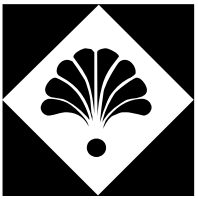

The End